যুগাচার্য শ্রীল প্রভুপাদ

শ্রীধাম মায়াপুরে
ইসকনের প্রতিষ্ঠাতা-আচার্য
শ্রীল অভয়চরণারবিন্দ ভক্তিবেদান্ত স্বামী
প্রভুপাদের পুষ্প-সমাধিমন্দির

ভক্তিবেদান্ত বুক ট্রাস্ট

শ্রীশ্রীগুরু-গৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

যুগাচার্য শ্রীল প্রভুপাদ

আন্তর্জাতিক কৃষ্ণভাবনামৃত সংঘের প্রতিষ্ঠাতা-আচার্য
শ্রীল অভয়চরণারবিন্দ ভক্তিবেদান্ত স্বামী প্রভুপাদ
এই সংস্থাটি প্রতিষ্ঠা করার মাধ্যমে এই
কলিযুগের যুগধর্ম 'হরিনাম সংকীর্তন' সারা
পৃথিবী জুড়ে প্রচার করেছেন এবং জাতি-ধর্ম-নির্বিশেষে
সকলকে ভগবানের শ্রীপাদপদ্মের আশ্রয় গ্রহণ করার
এক অপূর্ব সুযোগ প্রদান করছে

"শ্রীল প্রভুপাদ যে গৃহ নির্মাণ করেছেন
তাতে সারা বিশ্বের মানুষ আশ্রয় পেতে পারে।"

—ডাঃ এ, এল, ব্যাশাম্

প্রকাশক ঃ
ভক্তিবেদান্ত বুক ট্রাস্টের পক্ষে
শ্রীশ্যামরূপ দাস ব্রহ্মচারী

প্রথম সংস্করণ ঃ ১৯৯৩ - ২০,০০০ কপি
দ্বিতীয় সংস্করণ ঃ ১৯৯৪ - ২৫,০০০ কপি
তৃতীয় সংস্করণ ঃ ১৯৯৯ - ৫,০০০ কপি

গ্রন্থস্বত্ব ঃ
১৯৯৯, ভক্তিবেদান্ত বুক ট্রাস্ট
কর্তৃক সর্বস্বত্ব সংরক্ষিত

মুদ্রণ ঃ
শ্রীমায়াপুর চন্দ্র প্রেস
বৃহৎমৃদঙ্গ ভবন
শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

যুগাচার্য শ্রীল প্রভুপাদ

শ্রীমদ্ সৎস্বরূপ দাস গোস্বামী কর্তৃক রচিত ও
শ্রীমদ্ ভক্তিচারু স্বামী কর্তৃক বাংলায় অনূদিত

শ্রীল প্রভুপাদ লীলামৃত

গ্রন্থাবলম্বনে সংকলিত



সংকলন ঃ ভক্ত কৃশানু দাস
সম্পাদনা ঃ শ্রীস্বরূপ দামোদর দাস ব্রহ্মচারী

সূচীপত্র

ভূমিকা

যা খুব বড় তা কাছ থেকে ঠিকমত দেখা যায় না, তা যথাযথভাবে দর্শন করতে হলে দূর থেকে দর্শন করতে হয়। আন্তর্জাতিক কৃষ্ণভাবনামৃত সংঘ বা ইসকনের প্রতিষ্ঠাতা-আচার্য, আমাদের পরমারাধ্য গুরুদেব শ্রীল অভয়চরণারবিন্দ ভক্তিবেদান্ত স্বামী প্রভুপাদ আজকের পৃথিবীর এত কাছে রয়েছেন যে অধিকাংশ মানুষই এখনও চিনতে পারে নি তিনি কে—তিনি কত মহৎ। কালের প্রভাবে তিনি মানুষের দৃষ্টি থেকে যত দূরে যাবেন, ততই তারা তাঁর মহিমা হৃদয়ঙ্গম করতে পারবে।

শ্রীল প্রভুপাদ নিজে ছিলেন "তৃণাদপি সুনীচেন তরোরিব সহিষ্ণুনা" আদর্শের মূর্ত প্রতীক। তিনি নিজের মহিমা কখনও কারো কাছে প্রকাশ করেন নি। তাঁর অচিন্ত্য অবদানের সমস্ত কৃতিত্ব তিনি তাঁর গুরুদেব শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী ঠাকুর ও শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুকেই সব সময় দিয়েছেন। কিন্তু যাদের চোখ আছে তারা ঠিকই তাঁকে চিনতে পেরেছে। তবে তাদের সংখ্যা মুষ্টিমেয়। তাই যারা তাঁকে ভালবাসে, শ্রদ্ধা করে, তারা চায় তাঁর মহিমা জনসাধারণ হৃদয়ঙ্গম করুক, কেননা তাহলে তাদের কল্যাণ হবে। মহাপুরুষকে চিনতে পারলে, তাঁর দিব্য গুণাবলী সম্বন্ধে উপলব্ধি করতে পারলে তা কিছু পরিমাণে অর্জন করা যায়।

শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু ভবিষ্যদ্বাণী করে গেলেন, "পৃথিবীতে আছে যত নগরাদি গ্রাম / সর্বত্র প্রচার হইবে মোর নাম।" সে প্রায় পাঁচশ

বছর আগের কথা। তখন সাধারণ মানুষ জানতই না পৃথিবীটা কত বড়—তাতে সমস্ত নগর ও গ্রাম রয়েছে; আর সেই সমস্ত নগরে ও গ্রামে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর বাণী প্রচারের তো তারা কল্পনা পর্যন্ত করতে পারত না। পাঁচশ বছর কেন, আজ থেকে পঁচিশ বছর আগেও মানুষের কাছে ছিল তা কল্পনারও অতীত। কিন্তু শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু হচ্ছেন স্বয়ং ভগবান শ্রীকৃষ্ণ। তাই তাঁর ভবিষ্যদ্বাণী কখনও ব্যর্থ হবার নয়। যিনি সর্বশক্তিমান এবং সারা জগতের অধীশ্বর, তাঁর পক্ষে তো কোনো কিছুই অসম্ভব নয়। পক্ষান্তরে, তাঁরই ইচ্ছায় সবকিছু সম্পাদিত হয়। তাই তিনি যখন ইচ্ছা করেছেন সারা পৃথিবীর প্রতিটি নগরে এবং গ্রামে কৃষ্ণভক্তির প্রচার হোক, তখন তা হবেই। তবে সেই কার্যটি তিনি নিজে সম্পন্ন করতে চান নি। তা করার জন্য তিনি পাঠিয়েছেন তাঁর এক অতি অন্তরঙ্গ পার্ষদকে, এবং সেই মহান ব্যক্তিটি হচ্ছেন জগদ্‌গুরু শ্রীল অভয়চরণারবিন্দ ভক্তিবেদান্ত স্বামী প্রভুপাদ।

এই পুস্তিকাটিতে শ্রীল প্রভুপাদের জীবনালেখ্য সংক্ষেপে প্রদান করা হয়েছে। শ্রীল প্রভুপাদের একজন আমেরিকান শিষ্য সৎস্বরূপ দাস গোস্বামীর লেখা "প্রভুপাদ" নামক তাঁর দিব্য জীবন-চরিত সম্বলিত গ্রন্থ থেকে সংগ্রহ করে এই পুস্তিকাটি সংকলিত হয়েছে। সংক্ষিপ্ত হলেও এই পুস্তিকাটিতে শ্রীমান্ কৃশানু শ্রীল প্রভুপাদের জীবনালেখ্যের যে পরিলেখাটি তুলে ধরেছে, তা খুব সুন্দর হয়েছে। আশা করি, এই পুস্তিকাটির মাধ্যমে শ্রীল প্রভুপাদ সম্বন্ধে জানতে ঐকান্তিকভাবে আগ্রহী হয়ে পাঠকেরা "প্রভুপাদ" এবং তাঁর সম্বন্ধে অন্যান্য যে সমস্ত গ্রন্থাবলী রয়েছে, সেগুলি পাঠ করতে আগ্রহী হবেন।

এই পুস্তিকাটির নামকরণ সম্বন্ধে অনেকের মনে স্বাভাবিকভাবেই প্রশ্ন জেগেছিল, শ্রীল প্রভুপাদকে 'যুগাচার্য' বলে সম্বোধন করা হলে এই যুগের পূর্বতন মহান আচার্যদের অমর্যাদা করা হবে কি না।

তার উত্তরে আমার মনে হয়েছিল, এই যুগের যুগধর্ম 'হরিনাম সংকীর্তনের' প্রবর্তক শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর ভবিষ্যদ্বাণী সার্থক করে যিনি সারা পৃথিবীকে হরিনামের বন্যায় প্লাবিত করেছেন, তিনিই হচ্ছেন এই যুগের প্রকৃত আচার্য। তাঁর অবদান পূর্বতন আচার্যদের অবদান থেকে স্বতন্ত্র নয়। পক্ষান্তরে, তা তাঁদের অবদানের ভিত্তিতেই প্রতিষ্ঠিত এবং তাঁদের অবদানেরই চরম পরিণতি। পূর্বপুরুষেরা যেমন কোন বিশেষ বংশধরের মহিমা কীর্তিত হলে প্রসন্নই হন, তেমনই এই যুগের সমস্ত আচার্যেরা শ্রীল প্রভুপাদের অনবদ্য অবদানের জন্য তাঁকে 'যুগাচার্য' উপাধিতে ভূষিত করা হলে অবশ্যই অপ্রসন্ন হবেন না। সর্বোপরি, শ্রীল অভয়চরণারবিন্দ ভক্তিবেদান্ত স্বামী প্রভুপাদকে এই উপাধিতে ভূষিত করা হলে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুকেই যথাযথভাবে স্বীকৃতি দেওয়া হবে।

শ্রীরামচন্দ্রের বিজয়োৎসব
কলিকাতা, ১৯৯৩

ভক্তিচারু স্বামী

প্রস্তাবনা

আজ থেকে প্রায় পাঁচশো বছর আগে ভারতে হরিনামের প্লাবন এনেছিলেন শ্রীগৌরাঙ্গ মহাপ্রভু। সে যুগের রক্ষণশীল হিন্দু সমাজের জাতি-ধর্ম-ভাষার ক্ষুদ্রক্ষুদ্র প্রাচীরগুলি ভেসে গিয়েছিল সে মহাপ্লাবনে। তবে এতদিন যাবৎ এই হরিনামের জোয়ার আমাদের সনাতন ভারতভূমিতেই আবদ্ধ ছিল। অতি সম্প্রতি কিন্তু ভারতের সীমানা ছাপিয়ে বিশ্বের সর্বত্র প্লাবিত করেছে এই কৃষ্ণপ্রেমের বন্যা। পাশ্চাত্যের প্রতিটি রাজপথে, লাতিন আমেরিকায়, আফ্রিকার গহন অরণ্যে, এমন কি সাম্যবাদী সোভিয়েত দেশগুলিতেও আজ দেখা যাবে অসংখ্য কৃষ্ণভক্তকে, বৈভবের প্রাসাদ ছেড়ে যাঁরা নেমে এসেছেন পথের ধুলায়, মুক্তকণ্ঠে বিতরণ করছেন **'গোলোকের প্রেমধন, হরিনাম সংকীর্তন'**। এ কথা আজ সর্বজনবিদিত। দেশে-বিদেশে কৃষ্ণভক্তির এই অভূতপূর্ব প্রসার দেখে কেউ বা বিস্ময়ে মুগ্ধ হন, কেউ বা এর মধ্যে বিদেশী সাম্রাজ্যবাদের গন্ধ খুঁজে পান। কিন্তু অনেকেই জানেন না যে বিশ্বজোড়া এই মহান আধ্যাত্মিক আন্দোলনের রূপকার আমাদেরই বাংলার এক চিরস্মরণীয় মহাপুরুষ, যাঁর মহান কিংবদন্তিতুল্য জীবন-কথা শুনে আমাদের হৃদয় শ্রদ্ধায় আপ্লুত হয়, তিনি আমাদেরই দেশবাসী বলে গর্বে আমাদের বুক ফুলে ওঠে।

এই মহান বঙ্গসন্তানের নাম শ্রীল অভয়চরণারবিন্দ ভক্তিবেদান্ত স্বামী প্রভুপাদ, বা সংক্ষেপে শ্রীল প্রভুপাদ। তাঁর প্রতিষ্ঠিত ইস্‌কন বা

আন্তর্জাতিক কৃষ্ণভাবনামৃত সংঘ আজ বিশ্বব্যাপী এক উন্নত বৈদিক জীবনচর্যার দিশারীরূপে স্বীকৃত। ইস্কন বিশ্বমানবের মিলনতীর্থ। এখানে সাদা-কালো বা বাদামী-হলুদের ভেদ নেই, পূর্ব-পশ্চিমের তফাৎ নেই— সবাই বৈষ্ণব। সবাই কৃষ্ণের দাস, সবাই গৌরের উপাসক; সবাই শ্রীল প্রভুপাদের একান্ত অনুগত শিষ্য-সন্তান। এই ইস্কনের জনক শ্রীল প্রভুপাদের সাক্ষাৎ সান্নিধ্যে এসে অথবা তাঁর গ্রন্থাবলীর সংস্পর্শে এসে পৃথিবীর লক্ষ লক্ষ বিপথগামী মানুষ জীবনের নতুন অর্থ খুঁজে পেয়েছেন, নিজেদের জীবন সার্থক করে বিশ্বমানবের কল্যাণে জীবন উৎসর্গ করেছেন। রাষ্ট্রপুঞ্জ যে বিবদমান দেশগুলিকে ঐক্যবদ্ধ করতে ব্যর্থ হয়েছে, শ্রীল প্রভুপাদ সেই সমস্ত দেশবাসীর মধ্যে ভ্রাতৃত্বের বন্ধন রচনা করেছেন তাঁর অমৃততুল্য শিক্ষার দ্বারা।

আমাদের এই বঙ্গভূমি অজস্র মহামানবের আবির্ভাবে ধন্য। সেই সমস্ত কীর্তিমানদের নক্ষত্রপুঞ্জে শ্রীল প্রভুপাদ নিঃসন্দেহে উজ্জ্বলতম। প্রথমে অতিশয়োক্তি বলে মনে হলেও তাঁর অসামান্য জীবন যত আলোচিত হবে, তাঁর অতুলনীয় কীর্তিসমূহ যত জানা যাবে, ততই এই উক্তির সত্যতা বোঝা যাবে। যত দিন যাচ্ছে, দেশের ও বিদেশের শ্রেষ্ঠ পণ্ডিত ও বুদ্ধিজীবীরা শ্রীল প্রভুপাদের অসামান্য অবদানের কথা জেনে বিস্ময়ে অভিভূত হচ্ছেন। প্রথিতযশা সাংবাদিক শ্রীঅমিতাভ চৌধুরী যথার্থই বলেছেন, **"শ্রীল প্রভুপাদ বিংশ শতাব্দীর বিস্ময়। জীবনের শেষ প্রান্তে অকুতোভয় এই পরম বৈষ্ণব সম্পূর্ণ নিঃসম্বল অবস্থায় মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে এসে বিপ্লব ঘটিয়ে গেলেন। বিশ্ব জুড়ে অগণিত কৃষ্ণভক্ত ও গৌরভক্তের সৃষ্টি তাঁর অসাধারণ কীর্তি। শ্রীল প্রভু পাদের এই দিগ্বিজয় ধর্মপ্রচারের ইতিহাসে তুলনারহিত। .... স্বামী বিবেকানন্দের মার্কিন দেশ বিজয়ের কাহিনীর চেয়ে এই কাহিনী কম আকর্ষক নয়। বিদেশে পরিস্থিতি ও সময়ের দিক থেকে বিচার করলে**

শ্রীল প্রভুপাদের কীর্তি বরং একটু বেশীই।" প্রখ্যাত সাহিত্যিক শংকরের লেখাতেও একই সুর — **"ধর্মীয় সাধনার ক্ষেত্রে ভারতবর্ষের কৃতিত্ব এখনও অসাধারণ। .... মাপের দিক থেকে বলতে গেলে ইস্কনের প্রতিষ্ঠাতা শ্রীল অভয়চরণারবিন্দ ভক্তিবেদান্ত স্বামী প্রভুপাদ যা করে গিয়েছেন তা অন্য সমস্ত ভারতীয় প্রচারকের থেকে বেশী। এমনকি স্বামী বিবেকানন্দও এই বিপুল সাফল্য ও স্বীকৃতি বিদেশে অর্জন করেন নি।"** পাশ্চাত্যে শ্রীল প্রভুপাদের অত্যাশ্চর্য প্রভাব দেখে সাম্প্রতিককালের অন্যতম সাহিত্যিক শ্রীশীর্ষেন্দু মুখোপাধ্যায়ের উক্তি — **"ভক্তিবেদান্ত স্বামী যা করেছেন তা কেবল হুজুগের ব্যাপার নয়। কৃষ্ণভক্তিকে তিনি গভীরে সঞ্চার করতে পেরেছেন। কতখানি ভক্তি, নিষ্ঠা আর মনের জোর থাকলে আমেরিকার মতো দেশে এ কাণ্ড ঘটানো যায় সেটা ভেবে অবাক হয়েছি।"** আর আধুনিক কালের শ্রেষ্ঠ কবি ও লেখক শ্রীসুনীল গঙ্গোপাধ্যায় শ্রীল প্রভুপাদের পাশ্চাত্য বিজয়ের কথা জানার পর লিখেছেন : **"এটা কিন্তু একটা বিরাট ফেনোমেনান, আমাদের জানা দরকার। এ যুগে এ রকম রিয়েল লাইফ অ্যাডভেঞ্চার স্টোরি কল্পনাও করা যায় না। ... এটা একটা দিগ্বিজয় কাহিনী। ... পশ্চিমী জগৎ অস্ত্রশস্ত্র দিয়ে আর ব্যবসা দিয়ে এতদিন আমাদের জয় করে রেখেছিল, এখন প্রাচ্যদেশের একজন এসে আমাদের দর্শন দিয়ে এদের জয় করেছেন।"** পাশ্চাত্যের পণ্ডিত মনীষীবৃন্দও শ্রীল প্রভুপাদের প্রশংসাগানে মুখর। তাঁদের সকলের বক্তব্য এই স্বল্প পরিসরে দেওয়া সম্ভব নয়। তবে সুবিখ্যাত ভারত তত্ত্ববিদ্ ডাঃ এ এল ব্যাশামের উক্তিটি মনে রাখার মতঃ **"শ্রীল প্রভুপাদ তাঁর বলিষ্ঠ পারমার্থিক দৃষ্টিভঙ্গীর সাহায্যে যে গৃহ নির্মাণ করেছেন, সেখানে সারা পৃথিবীর মানুষ আশ্রয় পেতে পারে।"**

শ্রীল প্রভুপাদের অনবদ্য জীবন-কথা

সূর্যের যেমন জন্ম-মৃত্যু নেই, তেমন শ্রীভগবান ও তাঁর শুদ্ধ পার্ষদ-ভক্তদেরও জন্ম-মৃত্যু নেই। আবার রাত্রির অন্ধকার দূর করার জন্য সূর্য যেমন প্রতি প্রভাতে পূর্ব গগনে উদিত হয় ও দিনান্তে পশ্চিমে অস্তগামী হয়, ভগবানের শুদ্ধ ভক্তেরাও তেমন জগতের অজ্ঞানান্ধকার বিদূরিত করতে ভগবানেরই আদেশে আবির্ভূত হন ও তাঁদের কাজ সমাপন হলে এই জগৎ থেকে অপ্রকট হয়ে নিত্যধামে ভগবানের কাছে ফিরে যান। কিন্তু সাধারণ বদ্ধ জীবের মত কর্মফলে বার বার জন্ম-মৃত্যু তাঁদের হয় না। শ্রীল প্রভুপাদ ছিলেন এমনই একজন শুদ্ধ ভক্ত।

কোন সংকটময় যুগ-সন্ধিক্ষণে, কোন বিশেষ কার্য সাধন করতে, কোন ঐকান্তিক ভক্তের কাতর আহ্বানে সাড়া দিয়েও ভগবান এই জগতে আসেন বা তাঁর শুদ্ধভক্তকে পাঠিয়ে দেন। যেমন পাঁচশো বছর আগে যখন সনাতন ধর্ম ভক্তিবিহীন ও শুষ্ক কর্মকাণ্ডীয় আচারসর্বস্ব হয়ে উঠেছিল, তখন শ্রীঅদ্বৈত আচার্যের কাতর ডাকে সাড়া দিয়ে ভগবান শ্রীগৌরসুন্দর অবতীর্ণ হয়েছিলেন। তেমনই উনবিংশ ও বিংশ শতাব্দীর সন্ধিক্ষণে সনাতন বৈষ্ণব ধর্মের ইতিহাসে এক মহান সংকট উপস্থিত হয়েছিল। সেই যুগে আউল-বাউল-নেড়া-নেড়ি প্রভৃতি বৈষ্ণবনামধারী কিছু অপসম্প্রদায় মহাপ্রভুর প্রচারিত শুদ্ধ বৈষ্ণবধর্মকে কলঙ্কিত করেছিল। তাই শিক্ষিত সমাজ এই ধর্মের প্রতি আস্থা হারিয়ে নাস্তিক হয়ে উঠেছিল। পাশ্চাত্যের জনজীবনের

মোহিনী যাদুতে ভারতীয় যুবকরা প্রলুব্ধ হয়ে তাদের প্রাচীন বৈদিক কৃষ্টি বর্জন করে অন্ধের মত পাশ্চাত্যের অনুকরণ করছিল। আবার কেউ কেউ নির্বিশেষবাদ বা বিভিন্ন ভ্রান্ত দর্শনের দ্বারা প্রভাবিত হয়ে পড়ছিল।

সে যুগের শ্রেষ্ঠ বৈষ্ণব আচার্য ছিলেন শ্রীল সচ্চিদানন্দ ভক্তিবিনোদ ঠাকুর। বৈষ্ণব ধর্মকে গ্লানি-কবলিত দেখে তিনি যে কত ব্যথিত ছিলেন তা তাঁর একটি লেখায় ধরা পড়ে। আর্তিপূর্ণ এই রচনাটি যেন তাঁরই অশ্রুজলে বিধৌত — **"আহা! যেদিন ইংল্যাণ্ড, ফ্রান্স, রাশিয়া, প্রুশিয়া ও আমেরিকায় ভদ্দেশের ভাগ্যবন্ত পুরুষগণ নিশান, ডঙ্কা, খোল, করতালাদি লইয়া মুহুর্মুহু নিজ নিজ নগরে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর নাম উল্লেখপূর্বক হরিনাম কীর্তনের তরঙ্গ উঠাইবেন, যেদিন 'শচীনন্দন কী জয়' এরূপ ধ্বনি করত প্রসারিত বাহু হইয়া অস্মদ্দেশীয় ভক্তবৃন্দের সহিত আলিঙ্গন পূর্বক ভ্রাতৃভাব করিবেন, সে দিন কবে হইবে ?"**

শুদ্ধ ভক্তের এই কাতরোক্তি ভগবানের অশ্রুত থাকে নি। এই ভবিষ্যদ্বাণী সার্থক করবার জন্যই শ্রীল ভক্তিবেদান্ত স্বামী প্রভুপাদের আবির্ভাব। ১৮৯৬ সালের ১লা সেপ্টেম্বর অভয়চরণ দে (পরবর্তী কালের শ্রীল অভয়চরণারবিন্দ ভক্তিবেদান্ত স্বামী প্রভুপাদ) কলকাতায় আবির্ভূত হন। অভয়চরণের ১৫১নং হ্যারিসন রোডের বাড়িটি ছিল উত্তর কলকাতায়। তাঁর পিতৃদেব শ্রীযুক্ত গৌরমোহন দে সম্ভ্রান্ত সুবর্ণবণিক সমাজের একজন স্বচ্ছল কাপড়ের ব্যবসায়ী ছিলেন। তাঁর মায়ের নাম ছিল রজনী দেবী। অভয়চরণের জন্মের পরেই তাঁর পিতামাতা একজন জ্যোতিষীকে দিয়ে শিশুপুত্রের ঠিকুজী করিয়েছিলেন। সেই জ্যোতিষী একটি বিশেষ ভবিষ্যদ্বাণী করেছিলেন— **"শিশুটির বয়স যখন ৭০ বছর হবে, তখন তিনি সাগর**

পাড়ি দিয়ে বিদেশে যাবেন, এক বিখ্যাত ধর্মপ্রচারকরূপে স্বীকৃতি লাভ করবেন ও ১০৮ টি মন্দির প্রতিষ্ঠা করবেন।"

কলকাতার অত্যন্ত সম্ভ্রান্ত মল্লিক পরিবারের সঙ্গে গৌরমোহনের পারিবারিক সম্পর্ক ছিল। মল্লিকেরা কয়েকশ' বছর ধরে ইংরেজদের সঙ্গে সোনা আর লবণের ব্যবসা করেছিলেন। প্রকৃতপক্ষে মল্লিকেরা ছিলেন গৌতম গোত্রীয় বৈশ্য, কিন্তু মোঘল আমলে এক নবাব তাঁদের মল্লিক উপাধি দান করেন। পরে দে পরিবারের সঙ্গে তাঁদের বৈবাহিক সম্বন্ধ গড়ে ওঠে। হ্যারিসন রোডের সেই অংশটিতে রাস্তার দুপাশের সবকটি বাড়িই ছিল লোকনাথ মল্লিকের। গৌরমোহন দে সপরিবারে বাস করতেন মল্লিক বাড়ির তিন তলায়। তাঁদের সেই আবাসস্থলের ঠিক বিপরীত দিকেই ছিল মল্লিকদের শ্রীশ্রীরাধাগোবিন্দের মন্দির, যেখানে গত দেড় শ' বছর ধরে মল্লিকেরা শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণের সেবা করে আসছিলেন। অভয়চরণ শৈশবে প্রতিদিন তাঁর মা, বাবা অথবা ভৃত্যের সঙ্গে সেই মন্দিরে যেতেন। গৌরমোহন দে ছিলেন একজন শুদ্ধ বৈষ্ণব এবং তাঁর পুত্রকে তিনি কৃষ্ণভক্তরূপে মানুষ করে তুলছিলেন। বৈষ্ণববংশীয় হবার ফলে গৌরমোহন কখনও মাছ, মাংস, ডিম, চা অথবা কফি স্পর্শ করেননি। যাতে ইঁদুরেরা সন্তুষ্ট থাকে আর ক্ষুধার্ত হয়ে কাপড় কেটে না ফেলে, তাই প্রতিদিন রাত্রে দোকান বন্ধ করার আগে তিনি মেঝের ওপর এক বাটী অন্ন রেখে আসতেন। বাড়ি ফিরে তিনি শ্রীচৈতন্য-চরিতামৃত এবং শ্রীমদ্ভাগবত পাঠ করতেন, জপমালায় জপ করতেন ও শ্রীকৃষ্ণের বিগ্রহ আরাধনা করতেন। স্বভাবে তিনি নম্র ও স্নেহপরায়ণ ছিলেন।

গৌরমোহন চেয়েছিলেন তাঁর পুত্র যেন বৈষ্ণব হয়। তিনি চেয়েছিলেন যে, অভয়চরণ যেন রাধারাণীর সেবক হয়, ভাগবতের

প্রচারক হয় এবং মৃদঙ্গ বাজাতে শেখে। তাঁর বাড়িতে তিনি প্রায়ই সাধুদের নিমন্ত্রণ করতেন এবং তাঁদের বলতেন, "দয়া করে আমার পুত্রকে আশীর্বাদ করুন যাতে শ্রীমতী রাধারাণী তার প্রতি প্রসন্ন হন।"

অভয়চরণের জন্মের সময় তাঁর মা রজনীদেবীর বয়স ছিল ত্রিশ বছর। তাঁর স্বামীর মত তিনিও ছিলেন বর্ধিষ্ণু গৌড়ীয় বৈষ্ণব বংশোদ্ভূত। রজনীদেবী ছিলেন অত্যন্ত পতিব্রতা ও ধর্মপরায়ণা স্ত্রী—আদর্শ বৈদিক নীতি অনুসারে তিনি তাঁর পতি ও পুত্রকন্যাদের সেবায় সর্বতোভাবে মগ্ন থাকতেন। অভয়চরণ দেখতেন, তাঁর মা কিরকম সরল বিশ্বাসে সকলের মঙ্গলের জন্য প্রার্থনা করতেন, পূজা-পার্বণ ও ব্রতের অনুষ্ঠান করতেন এবং তা তাঁর মনে গভীরভাবে দাগ কেটেছিল।

প্রতি বছর কলকাতায় যখন জগন্নাথদেবের রথযাত্রা মহোৎসব হত, তা দেখে অভয়চরণ গভীরভাবে অভিভূত হতেন। কলকাতার সবচাইতে বড় রথযাত্রা ছিল মল্লিকদের রথযাত্রা। তাতে জগন্নাথ, বলদেব ও সুভদ্রাকে নিয়ে তিনটি রথ বের হত এবং জগন্নাথদেবের প্রসাদ জনসাধারণকে বিতরণ করা হত। অভয়চরণ শুনেছিলেন চারশ' বছর আগে কিভাবে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু পুরীর রথযাত্রা মহোৎসবে তাঁর পার্ষদদের নিয়ে কীর্তন ও নৃত্য করতেন। তিনি মাঝে মাঝে রেলওয়ে টাইমটেবিল দেখতেন অথবা লোককে জিজ্ঞাসা করতেন, বৃন্দাবন এবং পুরী যাওয়ার ভাড়া কত। তিনি ভাবতেন যে সেই টাকা যোগাড় করে তিনি সেখানে যাবেন।

তারপর একদিন অভয়চরণের নিজেরই রথযাত্রা মহোৎসব করার ইচ্ছা হল। গৌরমোহন তাঁকে তিন ফুট উঁচু একটি ব্যবহৃত রথ এনে দেন। পিতাপুত্র মিলিত প্রচেষ্টায় ষোলটি কাঠের থাম তাতে জুড়ে দেন এবং তার ওপর একটি চাঁদোয়া লাগিয়ে দেন। সেটি যেন ঠিক পুরীর রথেরই একটি ছোট সংস্করণ হয়েছিল। অভয় তাঁর খেলার সাথীদের তাঁকে সাহায্য করতে অনুপ্রাণিত করেছিলেন, বিশেষ করে

তাঁর বোন ভবতারিণীকে। স্বাভাবিকভাবেই তিনি ছিলেন তাঁর বন্ধুদের নেতা। তাঁর আবেদনে প্রতিবেশী মহিলারাও রথযাত্রা মহোৎসবে প্রসাদ বিতরণের জন্য নানারকম উপাদেয় খাদ্য প্রস্তুত করতে সম্মত হয়েছিলেন। অভয়ের সেই রথযাত্রা আটদিন ধরে অনুষ্ঠিত হয়েছিল এবং তাঁর সমস্ত প্রতিবেশীরা সেই শোভাযাত্রায় যোগ দিয়েছিলেন, রথের দড়ি ধরে টেনেছিলেন এবং করতাল ও মৃদঙ্গ বাজিয়ে সংকীর্তন করেছিলেন। এইভাবে অভয়চরণ নিজে জগন্নাথদেবের সেবায় যুক্ত হয়ে পরিচিত সকলকেও যুক্ত করেছিলেন। বৈষ্ণবাচার্য শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্তী ঠাকুর প্রকৃত সদ্‌গুরুর লক্ষণ বর্ণনা করে বলেছেন যে, তিনি শ্রীভগবানের নানাবিধ সেবায় স্বয়ং নিযুক্ত থাকেন এবং ভক্তগণকেও নিযুক্ত করেন। এই ঘটনা থেকে বোঝা যায় যে অতি শৈশবেও অভয়ের মধ্যে প্রকৃত সদ্‌গুরুর লক্ষণগুলি বর্তমান ছিল।

অভয়চরণের বয়স যখন ছ' বছর তখন তিনি তাঁর পিতার কাছে পূজা করার জন্য ভগবানের শ্রীবিগ্রহ চেয়েছিলেন। তাঁর অনুরোধে গৌরমোহন ছোট রাধাকৃষ্ণের যুগল মূর্তি তাঁকে কিনে দেন এবং তখন থেকে তিনি রাধাকৃষ্ণের পূজা শুরু করেন। তিনি যা খেতেন, সবার আগে তা রাধাকৃষ্ণকে নিবেদন করতেন এবং তাঁর পিতার অনুকরণে ধূপ-দীপ সহকারে সেই শ্রীবিগ্রহের আরতি করতেন, এবং রাত্রিবেলা তাঁদের শয়ন দিতেন। ষাটের দশকের শেষদিকে শ্রীল প্রভুপাদ যখন আমেরিকার বিভিন্ন নগরীতে রথযাত্রা মহোৎসবের প্রচলন করেন এবং বিশ্বব্যাপী তাঁর ইস্‌কনের মন্দিরগুলিতে যখন 'রাধাকৃষ্ণ' বিগ্রহের প্রতিষ্ঠা করেন, তখন তিনি বলেছিলেন যে এই সমস্ত কিছুই তিনি তাঁর পিতার কাছ থেকে শিখেছিলেন। কেবল পারমার্থিক সাহিত্য মুদ্রণ ও তা বিতরণের কাজ, প্রচারের জন্য যা খুবই জরুরি, তা তিনি তাঁর গুরু-মহারাজের কাছে শিখেছিলেন, যাঁর সঙ্গে তাঁর যুবক বয়সে সাক্ষাৎ হয়েছিল।

ইতিমধ্যে অভয়ের বয়স যখন পাঁচ বছর তখনই গৌরমোহন তাঁকে কলকাতার মতিলাল শীল ফ্রী স্কুলে ভর্তি করে দেন। শৈশব থেকেই তিনি ছিলেন অসাধারণ বুদ্ধি ও তীক্ষ্ণ মেধাসম্পন্ন কৃতি ছাত্র। লেখাপড়া, খেলাধুলা, ভজনপূজন, ব্যায়ামচর্চা, সাইকেল চড়া সবকিছুতেই অভয় ছিলেন পারদর্শী, নির্ভীক ও নিষ্ঠাবান বালক। অভয়ের বহুমুখী প্রতিভার বিকাশ দেখে বাড়ির আত্মীয়-স্বজন ও স্কুলের শিক্ষকরা তখনই অনুমান করেছিলেন যে তিনি একদিন স্বনামধন্য এক পুরুষে পরিণত হবেন।

বিদ্যালয়ের গণ্ডী সসম্মানে পার হওয়ার পর তিনি কলকাতার স্বনামধন্য শিক্ষা প্রতিষ্ঠান স্কটিশ চার্চ কলেজে ভর্তি হন। মহাত্মা গান্ধী রোডের বাড়ি থেকে তিনি প্রতিদিন সাইকেলে চড়ে কলেজে যেতেন। সুভাষচন্দ্র বসুর এক ক্লাশ নীচে অভয়চরণ পড়তেন। তাঁর অসাধারণ প্রতিভা ও নিষ্ঠার জন্য অধ্যাপকেরা তাঁকে খুব স্নেহ করতেন। লেখাপড়ার মাঝেই অভয় তাঁর আধ্যাত্মিক জ্ঞানচর্চা, প্রবন্ধ রচনা ও সাধুসঙ্গ চালিয়ে যাচ্ছিলেন। জড়জগতের মানুষকে কিভাবে ভগবন্মুখী করা যায় সে বিষয়ে তিনি সব সময় চিন্তাভাবনা করতেন, কারণ তিনি জগতে এসেছিলেন এক মহৎ উদ্দেশ্য নিয়ে।

কলেজে অধ্যয়ন করার সময়ে অভয়চরণের পিতা পরিচিত এক বণিক পরিবারের কন্যা রাধারাণী দত্তের সঙ্গে তাঁর বিবাহের আয়োজন করেন। বিবাহের পর বেশ কয়েক বছর অভয়ের স্ত্রী তাঁর বাপের বাড়িতে ছিলেন। তাই পরিবার প্রতিপালনের দায়িত্ব অভয়ের ছিল না। প্রথমে কলেজের পাঠ শেষ করাই ছিল তাঁর প্রধান দায়িত্ব।

স্কটিশ চার্চ কলেজে চতুর্থ বর্ষে পাঠের সময়ে অভয়চরণ স্নাতক উপাধি গ্রহণে অনীহা অনুভব করেছিলেন। স্বাধীনতা আন্দোলনে তাঁর

সহানুভূতি উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাচ্ছিল এবং তিনি বুঝতে পারছিলেন যে ইংরেজী শিক্ষা-ব্যবস্থার পরিবর্তে স্বদেশী শিক্ষা ও নিজস্ব সরকার অনেক মঙ্গলজনক। অভয়চরণ বিশেষভাবে গান্ধীজীর প্রতি আকৃষ্ট হয়েছিলেন। গান্ধীজীর সরল অনাড়ম্বর ব্যক্তিগত জীবন ও শ্রীমদ্ভগবদ্‌গীতার প্রতি অনুরাগ তাঁকে আকৃষ্ট করেছিল। গান্ধীজী ভারতীয় ছাত্রদের প্রচলিত শিক্ষা বর্জন করতে আহ্বান জানিয়েছিলেন। তিনি বলেছিলেন, বিদেশী পরিচালিত শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলি দাসত্বের মনোবৃত্তি সৃষ্টি করে। অভয়চরণ ১৯২০ সালে কলেজে তাঁর চতুর্থ বর্ষের পাঠ শেষ করে পরীক্ষায় সাফল্যের সঙ্গে উত্তীর্ণ হয়েছিলেন, কিন্তু তাঁর প্রাপ্য ডিগ্রী তিনি প্রত্যাখ্যান করেছিলেন।

জালিয়ানওয়ালাবাগের নৃশংস হত্যাকাণ্ডের প্রতিবাদে গান্ধীজী সম্পূর্ণ অসহযোগ আন্দোলনের ডাক দেন ও ইংরেজদের সবকিছু বর্জনের জন্য দেশবাসীর প্রতি আহ্বান জানান। অভয়চরণ তাঁর ডিগ্রী প্রত্যাখ্যানের মধ্যে দিয়েই তাঁর প্রতিবাদ জানিয়েছিলেন, ঠিক যেমনভাবে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর তাঁর 'নাইট' উপাধি প্রত্যাখ্যান করেছিলেন। অভয়ের পিতা সেজন্য অসন্তুষ্ট হলেও তিনি পুত্রের কাজকর্মে আপত্তি করেননি। ভারতীয় রাজনীতির ভবিষ্যতের চেয়ে তিনি পুত্রের ভবিষ্যৎ নিয়েই অধিক চিন্তিত ছিলেন। সেইজন্য তিনি তাঁর একজন ঘনিষ্ঠ হিতাকাঙ্ক্ষী ডাঃ কার্তিক চন্দ্র বোসের সহায়তায় তাঁর জন্য একটি ভাল চাকরির ব্যবস্থা করেন। ডাঃ বোস ছিলেন একজন লব্ধপ্রতিষ্ঠ শল্যচিকিৎসক এবং কলকাতায় 'বসু গবেষণাগার' ছিল তাঁর রাসায়নিক শিল্প প্রতিষ্ঠান। তিনি আনন্দের সঙ্গে অভয়চরণকে এই প্রতিষ্ঠানের বিভাগীয় ম্যানেজারের পদে অভিষিক্ত করেন।

ছোটবেলা থেকেই অভয়চরণ আধ্যাত্মিক জীবনে গভীরভাবে আগ্রহী ছিলেন। তাঁর পিতার কাছে যখনই সাধু ও বৈষ্ণবেরা আসতেন, তখন তাঁরা যা বলতেন, অভয় তা মনোযোগ সহকারে শুনতেন। কিন্তু কোন সাধুই এ পর্যন্ত তাঁকে গভীরভাবে প্রভাবিত করতে পারেননি। সে কারণে যুবক অভয়চরণ সাময়িকভাবে তথাকথিত সাধুসন্তদের প্রতি আস্থা হারিয়ে ফেলেছিলেন।

অবশেষে ১৯২২ সালে তাঁর জীবনে সেই স্মরণীয় ও বরণীয় দিনটি উপস্থিত হল। এই দিন অভয়চরণের সঙ্গে সাক্ষাৎ হয়েছিল মহা তেজস্বী বৈষ্ণবাচার্য শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী ঠাকুরের। প্রথমে যখন তাঁর কলেজের বন্ধু শ্রীনরেন্দ্রনাথ মল্লিক তাঁকে এক সাধু দর্শনের জন্য আহ্বান জানিয়েছিলেন, তখন তিনি যেতে সম্মত হন নি। কারণ ইতিপূর্বে বাড়িতে যে সব সাধুর সঙ্গে তাঁর সাক্ষাৎ হয়েছিল, তারা কেউই তাঁকে যথার্থ পারমার্থিক জ্ঞানে উদ্বুদ্ধ করতে পারে নি। কিন্তু নরেন মল্লিকের বিশেষ অনুনয়-বিনয়ের পর অভয়চরণ সেই সাধুকে ১নং উল্টোডাঙ্গা রোডে গৌড়ীয় মঠে দর্শন করতে গিয়েছিলেন।

উল্টোডাঙ্গার সেই বাড়িতে প্রবেশ করে তাঁরা দুজনে দেখলেন দিব্যজ্যোতিতে উদ্ভাসিত, ব্যাসাসনে উপবিষ্ট সেই মহাপুরুষ, গৌড়ীয় মঠের প্রতিষ্ঠাতা শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী ঠাকুরকে। উপস্থিত ভক্তমণ্ডলীর কাছে উদাত্তকণ্ঠে তখন তিনি ভগবানের অপ্রাকৃত মহিমা কীর্তন করেছিলেন। নরেন মল্লিক অভয়কে শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত ঠাকুরের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিলেন। তারপর তাঁরা দুজনে সেই মহান সন্ন্যাসীকে দণ্ডবৎ প্রণাম নিবেদন করলেন।

তাঁরা যখন সেই সৌম্য দর্শন সন্ন্যাসীকে প্রণতি নিবেদন করে উঠে বসতে যাচ্ছিলেন তখন তিনি কোন রকম ভূমিকার অবতারণা না করেই তাঁদের বললেন, "তোমরা শিক্ষিত যুবক। তোমরা কেন সারা পৃথিবী জুড়ে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর বাণী প্রচার করছ না?" তত্ত্বজ্ঞ পুরুষরা মানুষের হৃদয় দেখতে পান। শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত ঠাকুরও সেইরকম অভয়কে দেখেই বুঝেছিলেন যে তাঁর মধ্যে এক বিশাল সম্ভাবনা সুপ্ত রয়েছে, যা একদিন পৃথিবীব্যাপী এক মহান বিপ্লবের সূচনা করবে।

এই সন্ন্যাসীকে প্রথম সাক্ষাতেই মহাপ্রভুর বাণী প্রচারের কথা বলতে শুনে অভয়চরণ খুব অবাক হয়েছিলেন। শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত ঠাকুরের দ্বারা যদিও অভয় প্রভাবিত হয়েছিলেন তবুও কয়েকটি প্রশ্নের দ্বারা তাঁকে পরীক্ষা করতে চেয়েছিলেন। ভারতীয় জাতীয়তাবাদী চেতনায় উদ্বুদ্ধ অভয় তখন প্রশ্ন করেছিল, "আপনার চৈতন্য মহাপ্রভুর বাণী কে শুনবে? আমরা পরাধীন দেশের অধিবাসী; প্রথমে ভারতকে স্বাধীন হতে হবে। তা না হলে ব্রিটিশ শাসনের অধীনে আপনি কিভাবে ভারতীয় সংস্কৃতির প্রসার করবেন?"

শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী ঠাকুর উত্তর দিয়েছিলেন যে, কৃষ্ণভাবনামৃত ভারতীয় রাজনীতির পরিবর্তনের অপেক্ষা করে না, আর তা কোন শাসকের ওপর নির্ভরশীলও নয়। কৃষ্ণভাবনামৃত এতই গুরুত্বপূর্ণ যে তা কোনো দেশের ভৌগোলিক অথবা রাজনৈতিক অবস্থার অপেক্ষা করে না।

অভয়চরণ তাঁর জ্ঞানগর্ভ বাণী শুনে স্তম্ভিত হয়ে গিয়েছিলেন। সারা ভারতবর্ষ তখন আন্দোলনমুখর, আর তিনি সেই সাধুটিকে যা বলেছিলেন, সারা ভারতই তখন সেই মত পোষণ করেছিল। কিন্তু

ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী আরো বুঝিয়েছিলেন যে, সমস্ত সরকারই হল অস্থায়ী আর কৃষ্ণভাবনামৃতই চিরন্তন সত্য। তিনি বলেছিলেন, ব্যক্তিগত, সামাজিক অথবা রাজনৈতিক কল্যাণ তখনই সাধিত হয়, যখন পরমেশ্বর ভগবানের সঙ্গে জীবের নিত্য সম্পর্কের পুনঃপ্রতিষ্ঠা করার সাহায্য করে জীবকে পারমার্থিক পথে এগিয়ে নিয়ে যাওয়া হয়। অভয় এর আগে কখনও এত সহজ অথচ নির্ভীকভাবে কাউকে বৈষ্ণবদর্শন বিশ্লেষণ করতে শোনেননি।

তিনি এই বিতর্কে পরাজয় বরণ করেছিলেন, কিন্তু তা তাঁর ভাল লেগেছিল। শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী ঠাকুর স্বাধীনতা আন্দোলনকে যে ক্ষণস্থায়ী এবং অসম্পূর্ণ বলে বিশ্লেষণ করেছিলেন তা তাঁর মনে গভীরভাবে দাগ কেটেছিল। তিনি সেই রাত্রেই মানসিকভাবে সেই মহাপুরুষের শ্রীচরণে নিজেকে সমর্পণ করেছিলেন। পরে শ্রীল প্রভুপাদ বলেছিলেন, "আনুষ্ঠানিকভাবে নয়, কিন্তু আমার অন্তরে আমি তাঁর শিষ্যত্ব বরণ করে নিয়েছিলাম। আমি বুঝতে পেরেছিলাম যে আমি এক যথার্থ মহাপুরুষের সান্নিধ্যে এসেছি।"

শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী ঠাকুরের সঙ্গে প্রথম সাক্ষাতের পর অভয়চরণ গৌড়ীয় মঠের ভক্তদের সঙ্গে মেলামেশা করতে শুরু করেন। তাঁরা তাঁকে পড়বার জন্য গ্রন্থ দিয়েছিলেন এবং তাঁদের গুরুদেবের সম্পর্কে অনেক কথা বলেছিলেন। শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী ছিলেন শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর ধারায় এক মহান বৈষ্ণব আচার্য শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের সন্তান। শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর ছিলেন বৃটিশ সরকারের একজন উচ্চপদস্থ রাজকর্মচারী। তাঁর দৃপ্ত লেখনীর মাধ্যমে বৈষ্ণব ধর্মের মহিমা পুনঃপ্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। তিনি প্রমাণ করেছিলেন যে, শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর শিক্ষা হচ্ছে সবচাইতে উন্নত

স্তরের ভগবত্তত্ত্ববিজ্ঞান, এবং তা কোন বিশেষ গোষ্ঠী, ধর্ম বা জাতির জন্য নয়, তা বিশ্বের সমস্ত মানুষের জন্য। তাঁর সুযোগ্য পুত্র শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী ঠাকুর পিতার পদাঙ্ক অনুসরণপূর্বক ভারতের সর্বত্র ভ্রমণ করে যুক্তিপূর্ণ ওজস্বী ভাষণের মাধ্যমে মহাপ্রভুর শিক্ষা প্রচার করেন ও ৬৪টি শাখা সমন্বিত গৌড়ীয় মঠের প্রতিষ্ঠা করেন। অভয়চরণ গভীর আগ্রহের সঙ্গে এই মহান আচার্যদের লেখা পড়তে লাগলেন ও শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু প্রদর্শিত পন্থার অপরিসীম সম্ভাবনা সম্বন্ধে নতুন উপলব্ধি লাভ করলেন। তিনি বৈষ্ণব ঐতিহ্যের মাহাত্ম্য হৃদয়ঙ্গম করলেন এবং বুঝতে পারলেন যে এই বৈষ্ণব ধর্মের প্রচারের মাধ্যমেই এই অতি দুর্দশাগ্রস্ত যুগের মানুষের সর্বশ্রেষ্ঠ মঙ্গল সাধিত হবে।

১৯৩২ সালে অভয়চরণকে সপরিবারে ব্যবসার কাজে এলাহাবাদ যেতে হয় এবং পরের বছর সেখানেই তিনি আনুষ্ঠানিক দীক্ষার মাধ্যমে শ্রীল সরস্বতী ঠাকুরের শিষ্যত্ব গ্রহণ করেন। শ্রীল সরস্বতী ঠাকুর সচরাচর যা করতেন না, তাই করে অভয়কে একই সঙ্গে হরিনাম দীক্ষা ও গায়ত্রী মন্ত্র দীক্ষা প্রদানপূর্বক শিষ্যত্বে বরণ করেছিলেন। ভারতবর্ষে অভয়চরণের জীবনের পরবর্তী ত্রিশ বছরের কাহিনী হল তাঁর গুরু-মহারাজের আদেশ শিরোধার্য করে এককভাবে নানা প্রতিকূলতার মধ্যে কৃষ্ণভাবনামৃত প্রচারের চেষ্টা করার কাহিনী।

অভয়চরণের পারিবারিক দায়িত্ব ও কৃষ্ণভাবনামৃত প্রচারের দায়িত্ব ছিল পরস্পরবিরোধী। তাঁর স্ত্রী প্রচার কার্যে একেবারেই সহযোগিতা করতেন না। এমনকি তিনি যখন তাঁদের বাড়িতে অনেক লোকের সামনে শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা প্রসঙ্গে তিনি কথা বলতেন, তাঁর স্ত্রী তখন ওপর তলায় বসে চা পান করতেন। তবুও অভয়চরণ ধৈর্যের সঙ্গে তাঁকে কৃষ্ণভাবনায় যুক্ত করার চেষ্টা করছিলেন।

অভয়চরণের পক্ষে সব সময় তাঁর গুরু-মহারাজের সঙ্গে দেখা করা বা তাঁর সঙ্গে ভ্রমণ করা সম্ভব হচ্ছিল না। তবুও পরবর্তী চার বছরের মধ্যে তিনি তাঁর গুরু-মহারাজের সঙ্গে কমপক্ষে বারো বার দেখা করেছিলেন। স্বভাব-গম্ভীর শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী ঠাকুরের সঙ্গে তাঁর প্রবীণ শিষ্যরাও অত্যন্ত সতর্কভাবে কথা বলতেন, কিন্তু অভয়কে তিনি বরাবরই খুব স্নেহ করতেন ও সহজভাবে তাঁর সঙ্গে কথা বলতেন।

এদিকে এলাহাবাদে তাঁর ব্যবসা চলল না, তাই অভয়চরণ বোম্বেতে আবার নতুন করে ব্যবসা শুরু করলেন। এখানে তাঁরই সাহায্যে গৌড়ীয় মঠের একটি কেন্দ্র স্থাপিত হল। ১৯৩৫ সালের ২৫শে ফেব্রুয়ারী শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত ঠাকুরের বাষট্টিতম জন্মবার্ষিকীর সময় এই মঠে তাঁর গুরুভ্রাতাদের এক সম্মেলনে তিনি একটি কবিতা ও একটি প্রবন্ধ পাঠ করেছিলেন। তাঁর গুরুমহারাজ তাঁর এই লেখাগুলি পড়ে চমৎকৃত হয়েছিলেন। বিশেষ করে কবিতার একটি স্তবক তাঁর এত ভাল লেগেছিল যে তিনি সেটি তাঁর অতিথিদের দেখিয়েছিলেন—

Absolute is sentient, thou hast proved,
Impersonal calamity thou hast moved.

বাংলায় যার অর্থ হল—

পরম ব্রহ্ম পরমপুরুষ প্রমাণ করিলে তুমি।
নির্বিশেষের নির্বাণ-বাদ ত্যজিল ভারত ভূমি॥

এই ছোট্ট স্তবকটিতেই অভয়চরণ নির্বিশেষ দর্শনের বিরুদ্ধে তাঁর গুরুদেবের ধর্মগত ভাবটি ফুটিয়ে তুলেছিলেন। তাঁর লেখা পড়ে মুগ্ধ শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী ঠাকুর গৌড়ীয় মঠের মুখপত্র 'দ্য হারমোনিস্ট'-এর সম্পাদককে বলেছিলেন—"ও যা লেখে, তাই ছাপিও।"

১৯৩৫-এর নভেম্বরে বৃন্দাবনে রাধাকুণ্ডে অভয়চরণের সঙ্গে তাঁর গুরু-মহারাজের এক তাৎপর্যপূর্ণ সাক্ষাৎকার হয়। অত্যন্ত দুঃখের সঙ্গে তিনি অভয়কে জানিয়েছিলেন যে তাঁর কয়েকজন প্রধান শিষ্য বিবাদে মত্ত হয়েছে। গভীর উদ্বেগের সঙ্গে তিনি বলেছিলেন, "একদিন কলকাতার গৌড়ীয় মঠে আগুন লাগবে, আর দলীয় স্বার্থের এই আগুন ক্রমশ ছড়িয়ে পড়ে সব কিছু ধ্বংস করবে।" এরপর সরাসরিভাবে তিনি অভয়কে গভীর আবেগের সঙ্গে বলেছিলেন— "আমার কিছু বই প্রকাশ করার ইচ্ছা ছিল। যদি তুমি কোনদিন অর্থ সংগ্রহ করতে পার, পারমার্থিক বই ছাপিও।" এই কথাগুলি অভয়ের হৃদয়ে গভীরভাবে গাঁথা হয়ে গিয়েছিল।

শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী ঠাকুর এই নশ্বর জগৎ থেকে ১৯৩৬ সালের ডিসেম্বরে অপ্রকট হয়েছিলেন। তাঁর অপ্রকটের এক মাস আগে অভয়চরণ প্রচার করার তীব্র বাসনায় তাঁর গুরু-মহারাজের কাছে চিঠি লিখে জানতে চেয়েছিলেন তিনি কোন নির্দিষ্ট সেবা করতে পারেন কিনা। দু' সপ্তাহ পরে অভয়চরণ তাঁর চিঠির উত্তর পেয়েছিলেন। ভক্তিসিদ্ধান্ত ঠাকুর লিখেছিলেন, "আমি স্থির নিশ্চিত যে যাঁরা বাংলা ও হিন্দী ভাষা জানেন না, সেইসব মানুষের কাছে তুমি ইংরেজিতে আমাদের চিন্তা ও যুক্তি ব্যাখ্যা করতে পারবে। আশা করছি তুমি নিজেকে একজন সুদক্ষ ধর্মপ্রচারকে পরিণত করবে।"

অভয়চরণ তখনি বুঝতে পারলেন এ হল সেই নির্দেশ যা তিনি ১৯২২ সালে গুরুদেবের সঙ্গে প্রথম সাক্ষাতের সময়েই লাভ করেছিলেন। এখন তিনি এটিকে চূড়ান্ত অনুমোদন হিসাবে গ্রহণ করলেন। জীবনের উদ্দেশ্য সম্বন্ধে এখন আর তাঁর কোন সন্দেহই রইল না।

"মঠে আগুন লাগবে"— এই সম্বন্ধে শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত ঠাকুরের ভবিষ্যদ্বাণী অচিরেই সত্য হয়ে প্রকাশিত হয়েছিল। কয়েকজন নেতৃস্থানীয় ভক্ত গৌড়ীয় মঠের উত্তরাধিকার নিয়ে কলহ শুরু করেছিল এবং তা ক্রমশ জটিলতর রূপ ধারণ করে আইনগত বিবাদের পর্যায়ে নেমে গিয়েছিল। অভয়চরণ সমস্ত কলহ থেকে দূরে থাকতেন, কিন্তু গভীর মর্মাহত হয়েছিলেন এই দেখে যে ঐক্যবদ্ধভাবে প্রচারের যে আজ্ঞা তাঁর গুরু-মহারাজ দিয়েছিলেন, তা অগ্রাহ্য করা হচ্ছিল। গৌড়ীয় পত্রিকায় প্রকাশিত তাঁর কিছু লেখায় তাঁর এই অন্তর্দাহের পরিচয় মেলে। যেমন একস্থানে তিনি লিখেছেন— **"পতিতপাবন শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী ঠাকুরের অন্তর্ধানের পর কি আবার আমরা পতিত, নরাধম, দুষ্কৃতিপরায়ণ থাকিয়া যাইব? আমাদের কি উদ্ধার হইবে না?"**

১৯৩৯ সালে অভয়চরণের প্রথম গ্রন্থ "গীতোপনিষদের সূচনা" তাঁর গুরুভ্রাতাদের স্বীকৃতি লাভ করে; তাঁরা অভয়কে 'ভক্তিবেদান্ত' উপাধিতে ভূষিত করেন। ব্যবসা ও পরিবার প্রতিপালনের চেয়ে হরিকথা প্রচার ও বৈষ্ণবগ্রন্থ প্রণয়নেই তিনি অধিক আগ্রহী ছিলেন। সেই সময়ে ভারতের নির্মল আকাশে ঘনিয়ে এসেছিল দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের কালো মেঘ। শত্রুপক্ষের হাতে চলে যাওয়ার আশঙ্কায় ইংরেজরা খাদ্যশস্যপূর্ণ কয়েকটি জাহাজ ডুবিয়ে দিয়েছিল। অভয়চরণ দুর্ভিক্ষ ও যুদ্ধের মর্মান্তিক পরিণতি দেখেছিলেন। শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী ঠাকুরের কাছে প্রাপ্ত শিক্ষার দ্বারা এই দুর্ভিক্ষের গ্লানি তিনি হৃদয়ঙ্গম করেছিলেন। পরমেশ্বর ভগবানের কৃপায় পৃথিবীতে যথেষ্ট খাদ্য উৎপন্ন হতে পারে, কেবল মানুষের লোভ আর ভ্রান্ত পরিচালনা এই দুঃখের জন্য দায়ী। শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত বলেছিলেন, "পৃথিবীতে খাদ্যের অভাব নেই, শুধু একটি জিনিসেরই অভাব, তা হল কৃষ্ণভক্তি।"

যুদ্ধপীড়িত নাগরিকদের জন্য পরমেশ্বর ভগবানের একটি বিশেষ বার্তা প্রচারের প্রয়োজন অনুভব করেছিলেন অভয়চরণ। তিনি একাই একটি পত্রিকা প্রকাশনার কাজে লেগে গেলেন। লেখা, টাইপ করা ও সম্পাদনার কাজ তিনি একাই করতে লাগলেন। তাঁর পত্রিকাটি ছিল ইংরেজীতে, কারণ তাঁর বার্তা ছিল সমগ্র বিশ্ববাসীর জন্য। তিনি তার নাম দিলেন 'Back To Godhead' : 'শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী ঠাকুরের নির্দেশ অনুসারে অভয়চরণ দে কর্তৃক সম্পাদিত ও প্রতিষ্ঠিত।' তাঁর ব্যবসার লভ্যাংশ দ্বারা তিনি এই পত্রিকাটি প্রকাশ করতেন।

বারবার তিনি সরকারের কাছে তাঁর পত্রিকা প্রকাশের জন্য কাগজ সরবরাহের আবেদন করেছিলেন। যদিও তিনি ছিলেন কোটি কোটি মানুষের মধ্যে সহায়-সম্বলহীন একজন মানুষ, কিন্তু তাঁর গুরুমহারাজের প্রতি তাঁর বিশ্বাস ছিল অগাধ, এবং পরমেশ্বর ভগবানের উপরে তাঁর আস্থা ছিল সুদৃঢ়। তাঁর আত্মবিশ্বাসও অত্যন্ত দৃঢ় ছিল, তাই যুদ্ধের সময় ধ্বংস আর মৃত্যুর মধ্যেও তিনি তাঁর পত্রিকার প্রথম সংখ্যাটি প্রকাশ করতে পেরেছিলেন, "কেননা সে সময়ে সেইরকম সাহিত্যের খুব প্রয়োজন ছিল।"

এমনকি অভয়চরণের যখন নিয়মিত ভাবে পত্রিকাটি প্রকাশের আর্থিক সংস্থান ছিল না, তখনো তিনি নিজের লেখা চালিয়ে যাচ্ছিলেন। এমনকি চিঠিপত্রের মাধ্যমেও তিনি মহাপ্রভুর বাণী প্রচার করে চলেছিলেন। তিনি বহু রাজনৈতিক নেতা, সম্মানিত ব্যক্তি এবং সংবাদপত্রে যাদের লেখা প্রকাশিত হচ্ছিল তাদের তিনি লিখতেন। নিজেকে একজন বিনীত সেবক-রূপে উপস্থাপিত করে তিনি বিশ্লেষণ করতেন কিভাবে সমস্ত সমস্যার সমাধান কৃষ্ণভাবনামৃতের মাধ্যমে হতে পারে। কখনো কখনো তিনি সরকারী অফিসার ও সচিবদের কাছে উত্তর পেলেও সাধারণত তিনি উপেক্ষিতই হতেন, তবে নিরাশ হতেন না।

অভয়চরণ গান্ধীজীকেও পারমার্থিক সেবাকার্যে যুক্ত করার কথা ভেবেছিলেন। ১৯৪৭ সালের ৭ই ডিসেম্বর তিনি দিল্লীতে গান্ধীজীকে একটি দীর্ঘ পত্র লেখেন। নিজেকে গান্ধীজীর 'এক অজ্ঞাত পরিচয় হিতাকাঙ্ক্ষী' হিসাবে পরিচয় দিয়ে লিখেছিলেন, "আমি আপনাকে একজন শুভাকাঙ্ক্ষী বন্ধু হিসেবে বলছি, যদি আপনি অত্যন্ত কলঙ্কজনকভাবে মৃত্যুবরণ করতে না চান, তা হলে শীঘ্র সক্রিয় রাজনীতি থেকে অবসর গ্রহণ করুন। পারমার্থিক জীবন গ্রহণ করে অন্তত একমাসের জন্য শ্রীমদ্ভগবদ্‌গীতা আলোচনা করুন।" অভয়চরণ তাঁর পত্রের কোন উত্তর পাননি, এবং ঠিক এক মাস পরে ৩০শে জানুয়ারী গান্ধীজী আততায়ীর হাতে নিহত হন। একমাস আগে লেখা তাঁর চিঠিটি ভবিষ্যদ্বাণীর মত সত্য হয়ে গিয়েছিল।

নিজের লেখার প্রতি গভীর মনঃসংযোগ এবং কৃষ্ণভাবনামৃত প্রচারের কাজে সম্পূর্ণ আত্মনিয়োগের ফলে তাঁর ব্যবসায়িক ও পারিবারিক কাজকর্মের ক্ষতি হচ্ছিল। যখন অভয়চরণের এলাহাবাদের ব্যবসা নিদারুণভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়ে পড়ল; তিনি লক্ষ্ণৌতে একটি নতুন কারখানা খুলতে চেষ্টা করেছিলেন। প্রথমদিকে কিছু লাভ হলেও পরে সেটিরও লোকসান হতে থাকে ও অবশেষে বন্ধ হয়ে যায়। কিন্তু এর মধ্যেও তাঁর প্রচারের উদ্যম অব্যাহত ছিল। ১৯৫২ সালের অক্টোবরে ব্যবসার কাজে যখন তিনি ঝাঁসি যান তখন সেখানকার গীতামন্দিরে ভাষণ দেওয়ার জন্য তিনি আমন্ত্রিত হন। ঝাঁসির জনসাধারণ তাঁর কৃষ্ণভাবনা প্রচারে সাড়া দেন ও আগ্রহ প্রকাশ করেন। নিজের পুত্র ও ভ্রাতুষ্পুত্রের ওপর তাই তাঁর ওষুধের কারখানার দায়িত্বভার অর্পণ করে তিনি ঝাঁসি চলে যান। ১৯৫৩ সালের ১৬ই মে সেখানে ছবির মত সুন্দর ভারতীভবনে তিনি 'ভক্তসংঘ' নামে একটি মন্দির প্রতিষ্ঠা করেন। কিন্তু মাত্র ৬মাস সেখানে প্রচার কার্যে নিমগ্ন থাকার

পর একদিন তিনি একটি টেলিগ্রাম পান যে এলাহাবাদে তাঁর দোকানে চুরি হয়ে গেছে। তাঁর ভৃত্য টাকা-পয়সা, ঔষধপত্র এবং অন্যান্য যাবতীয় মূল্যবান সামগ্রী চুরি করে পালিয়ে যায়। এই সংবাদ পেয়ে তিনি নীরবে হাসতে থাকেন ও তারপর শ্রীমদ্ভাগবতের সেই শ্লোকটি উচ্চারণ করেন যেখানে শ্রীভগবান বলেছেন, "আমি যখন কাউকে বিশেষভাবে কৃপা করি, তখন আমি তার সমস্ত জাগতিক সম্পদ হরণ করে নিই।" তখন তাঁর দারিদ্র্যগ্রস্ত শোচনীয় অবস্থা দেখে তাঁর বন্ধুবান্ধব আর আত্মীয়-স্বজনেরা তাঁকে পরিত্যাগ করে। যখন ঝাঁসির একজন বন্ধু তাঁকে এলাহাবাদে ফিরে যেতে বলেন, তিনি উত্তর দিয়েছিলেন— "না, যা হয়েছে ভালই হয়েছে। একটা মস্ত বড় বন্ধন আজ ছিন্ন হল। এখন আমি পুরোপুরি কৃষ্ণের সেবায় যুক্ত হব।"

কলকাতায় তাঁর পরিবারের লোকজনের সঙ্গে দেখা করতে গিয়ে অভয়চরণ তাঁর পারিবারিক দায়িত্ব থেকে চিরবিচ্ছেদ ঘটিয়েছিলেন। তাঁর স্ত্রী এবং অন্যান্য আত্মীয়েরা ঝাঁসিতে তাঁর প্রচারকার্য পছন্দ করছিলেন না। তাঁরা চাইছিলেন অভয়চরণ যেন ব্যবসা এবং পারিবারিক কাজকর্মে আরো বেশী সময় দেন। কিন্তু যখন তাঁর বন্ধুরা দেখা করতে আসতেন, অভয়চরণ শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা প্রসঙ্গে এবং কৃষ্ণভাবনামৃত প্রচারের বিষয়ে কথা বলতেন, যেমন তিনি ঝাঁসিতে বলতেন। তিনি চেষ্টা করেছিলেন যাতে তাঁর স্ত্রী মনেপ্রাণে কৃষ্ণানুশীলন করেন, কিন্তু তাঁর স্ত্রী অত সহজে বুঝবার পাত্রী ছিলেন না।

অভয়চরণ তাঁর স্ত্রীকে সবসময় চা পান করতে নিষেধ করতেন। নিষ্ঠাবান বৈষ্ণব পরিবারে এটি রীতিবিরুদ্ধ ছিল। শেষ পর্যন্ত তিনি বলেছিলেন, "আমি এবং চা—এই দুটির মধ্যে তোমাকে যে কোন একটি বেছে নিতে হবে। হয় চা ছাড়, অথবা আমাকে।" তাঁর স্ত্রী কৌতুক-ছলে বলেছিলেন, "ঠিক আছে, তাহলে আমাকে আমার স্বামীকেই ছাড়তে হবে।"

একদিন তাঁর স্ত্রী একটি বড় ভুল করে ফেলেছিলেন। তিনি তাঁর স্বামীর শ্রীমদ্ভাগবত গ্রন্থ চা আর বিস্কুট কেনার জন্য বিক্রী করে দিয়েছিলেন। অভয়চরণ এতে অত্যন্ত মর্মাহত হয়েছিলেন এবং তার এই ঘটনাটি তাঁকে তাঁর পরিবার থেকে বিচ্ছিন্ন করে দিয়েছিল, দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হয়ে তিনি গৃহত্যাগী হয়েছিলেন।

সেই সময়টি ছিল অভয়চরণের পক্ষে খুব খারাপ সময়। তিনি ঝাঁসিতে ফিরে এসেছিলেন, কিন্তু তাঁকে তাঁর বাসভবনটি ছেড়ে দিতে হয়েছিল। রাজ্যপালের স্ত্রী সেখানে তাঁর পরিকল্পিত 'ভক্তসংঘ'-এর পরিবর্তে একটি নারীসমিতি গড়ে তুলতে চেয়েছিলেন। থাকবার কোন জায়গা না পাওয়ায় ও যথাযোগ্য সহায়তা না পাওয়ার জন্য তিনি ঝাঁসি ত্যাগ করেছিলেন, কিন্তু বিশ্বব্যাপী ভক্তসংঘ গড়ে তোলার পরিকল্পনাটি তিনি ত্যাগ করেন নি। দিল্লীতে একটি আশ্রমে গিয়ে তাঁর গুরুভ্রাতাদের সঙ্গে কিছুদিন থাকার পর তিনি একজন ভিক্ষুকের মত বিভিন্ন মন্দিরে অথবা ধর্মপরায়ণ ধনী ব্যক্তিদের গৃহে নিমন্ত্রিত হয়ে তাদের বাড়িতে থাকছিলেন। তাঁর অন্ন, বস্ত্র, বাসস্থানের অভাব চরমে উঠেছিল। শৈশব থেকেই তাঁর এ সবের অভাব কোনদিন হয়নি। তিনি তাঁর পিতার প্রিয় পুত্র ছিলেন এবং শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতীর বিশেষ স্নেহধন্য শিষ্য ছিলেন। কিন্তু সেই সময় তিনি ছিলেন সম্পূর্ণ একলা।

তিনি লেখালেখি করে কালাতিপাত করছিলেন এবং যাদের কাছে শ্রীমদ্ভগবদ্গীতার প্রচার করছিলেন তাদের কাছে সাহায্য প্রার্থনা করছিলেন। একটি স্থায়ী বাসস্থান পাওয়াই তাঁর লক্ষ্য ছিল না, পারমার্থিক রচনাবলী প্রকাশ করা এবং একটি বলিষ্ঠ কৃষ্ণভাবনামৃত

আন্দোলন গড়ে তোলাই ছিল তাঁর লক্ষ্য। সেইজন্য তিনি ধনী ব্যক্তিদের সঙ্গে যোগাযোগ করে তাঁর পাণ্ডুলিপি দেখিয়ে তাঁর ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানের বিষয়ে আলোচনা করতেন। কিন্তু তাতে অল্প কয়েকজনই কেবল সাড়া দিয়েছিলেন, এবং তাদের সাহায্যের পরিমাণও ছিল কেবল ৫-১০ টাকা। তবু যে ভাবেই হোক 'Back To Godhead' পত্রিকাটি মুদ্রণের জন্য তিনি অর্থ সংগ্রহ করে যাচ্ছিলেন।

অর্থাভাবে তিনি প্রয়োজনীয় বস্ত্র পর্যন্ত কিনতে পারেন নি। হিমপ্রবাহিত দিল্লীর পথ দিয়ে গরম জামা ছাড়াই হেঁটে হেঁটে তিনি পত্রিকাটির 'প্রুফ' দেখতে ছাপাখানায় যেতেন। মুদ্রক যখন তাঁকে জিজ্ঞাসা করতেন কেন তিনি এত কঠোর পরিশ্রম করে পত্রিকাটি প্রকাশ করার চেষ্টা করছেন, তখন তিনি উত্তর দিতেন, "এটিই আমার জীবনের একমাত্র উদ্দেশ্য।"

মুদ্রকের থেকে ছাপা পত্রিকাগুলি নিয়ে তিনি সেগুলি বিতরণের জন্য শহরের পথে পথে ঘুরে বেড়াতেন। একটি চায়ের দোকানের কাছে তিনি সেগুলি নিয়ে বসতেন, আর কেউ যখন তাঁর কাছে এসে বসত, তিনি তাকে একটি পত্রিকা কেনবার জন্য অনুরোধ করতেন। চায়ের দোকানে পত্রিকা বিতরণ করা ছাড়াও তিনি ডাক মারফৎ ভারতে ও বিদেশে বিনামূল্যে পত্রিকা পাঠাতেন।

এমনকি গ্রীষ্মকালে প্রচণ্ড গরমের সময় যখন দিল্লীর তাপমাত্রা ১১৪ ডিগ্রীতে পৌঁছাত, তখনও অভয়চরণ প্রত্যেকদিন তাঁর পাক্ষিক পত্রিকাটি বিতরণের জন্য বাইরে যেতেন। একদিন অত্যন্ত উত্তাপে তিনি সংজ্ঞাহীন হয়ে রাস্তায় পড়ে ছিলেন যতক্ষণ না তাঁর এক বন্ধু তাঁকে গাড়িতে তুলে চিকিৎসকের কাছে নিয়ে যায়। আরেকবার তাঁকে একটি গরু গুঁতিয়ে ফেলে দেয় এবং তিনি বেশ কিছুক্ষণ পথের উপর সংজ্ঞাহীন পড়ে ছিলেন।

কখনো কখনো তিনি ভাবতেন কেন তিনি গৃহত্যাগ করেছেন, আর কেনই বা তিনি ব্যবসা ত্যাগ করে পথে এসেছেন? কিন্তু কয়েকবছর পরে যখন পৃথিবীর সর্বত্র তাঁর কৃষ্ণভাবনামৃত সংঘ প্রতিষ্ঠিত হল, তখন তিনি বুঝতে পেরে ছিলেন যে সেই অবস্থাটি ছিল এক বিশেষ পরীক্ষার মাধ্যমে শ্রীকৃষ্ণের কৃপা।

এরপর অভয়চরণ স্থির করেছিলেন যে পবিত্র বৃন্দাবন ধামে থেকে তিনি তাঁর রচনার কাজ চালিয়ে যাবেন। যমুনার তীরে বংশী-গোপালজীর মন্দিরে তিনি খুব অল্প ভাড়ায় সাধারণ একটি ঘর নিয়েছিলেন। তাঁর ছাদের ছোট্ট ঘরটিতে তিনি দেখতেন সামনে দিয়ে যমুনা বয়ে যাচ্ছে। সেই প্রশস্ত নদীবক্ষ অপরাহ্নে সূর্যের আলোয় ঝলমল করত। তিনি সন্ধ্যাবেলায় যমুনার ঠাণ্ডা বাতাস উপভোগ করতেন, আর কেশীঘাটে ভক্তদের সান্ধ্য কীর্তন শুনতে পেতেন।

এদিকে তাঁর দিল্লীতে যাতায়াতের খরচ, গ্রন্থ প্রকাশ ও সেগুলি ডাকযোগে পাঠাবার খরচ সংগ্রহ করা বেশ কঠিন হয়ে পড়েছিল। ক্রমান্বয়ে পাক্ষিক পত্রিকাটির বারোটি সংখ্যা প্রকাশের পর অভয়চরণের টাকা শেষ হয়ে গেল। মুদ্রক বলেছিলেন শুধু বন্ধুত্বের খাতিরে তিনি আর ছাপাতে পারবেন না। তবুও অভয়চরণ লিখে যাচ্ছিলেন। একদিন নিঃস্ব এবং অসহায় অভয়চরণ 'বৃন্দাবনে ভজন' নামে একটি বাংলা কবিতা লিখেছিলেন। তার কতগুলি পংক্তি খুবই মর্মস্পর্শী। যেমন—

'অর্থহীন দেখি মোরে ছেড়েছে সবাই।
কুটুম্ব, আত্মীয় আর বন্ধুজন ভাই॥
দুঃখ হয় হাসি পায়, একা বসে হাসি।
মায়ার সংসার এই কাকে ভালবাসি ?'

একদিন রাতে অভয়চরণ আবার সেই স্বপ্নটি দেখলেন, যা আগে গৃহস্থ আশ্রমে তিনি কয়েকবার দেখেছিলেন। তাঁর গুরুদেব শ্রীল

ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী ঠাকুর স্বপ্নে তাঁকে অনুসরণ করতে বলেছিলেন, বারবার তিনি তাঁকে ডেকে বলেছিলেন, "সন্ন্যাস নাও।"

এই স্বপ্নটিকে অভয়চরণ তাঁর গুরু-মহারাজের আদেশ বলেই মনে করেছিলেন। তাই ১৯৫৯ সালের ১৫ই সেপ্টেম্বর মথুরার কেশবজী গৌড়ীয় মঠে তিনি তাঁর জ্যেষ্ঠ গুরুভ্রাতা শ্রীল ভক্তিপ্রজ্ঞান কেশব মহারাজের কাছে সন্ন্যাস গ্রহণ করেন। এইভাবে তিনি গৈরিক বসনধারী ভক্তিবেদান্ত স্বামী মহারাজে পরিণত হয়েছিলেন।

এইবার তিনি শ্রীমদ্ভাগবতের ইংরেজী অনুবাদ ও ভাষ্য রচনা শুরু করলেন। সেই সময়ে শ্রীল ভক্তিবেদান্ত স্বামী প্রভুপাদ নতুন দিল্লীতেও একটি বাসস্থানের সন্ধান করছিলেন, কারণ গ্রন্থ মুদ্রণের জন্য তাঁকে প্রায়ই সেখানে আসতে হচ্ছিল। শ্রীভগবান তাঁর শুদ্ধভক্তের আকাঙ্ক্ষা অপূর্ণ রাখেন না। তিনি প্রকাশনা সূত্রে পরিচিত এক ভদ্রলোকের মাধ্যমে একটি মন্দিরের স্বত্বাধিকারীর সঙ্গে যোগাযোগ করেছিলেন এবং সেই ব্যক্তি চাঁদনীচকের নিকটে তাঁর রাধাকৃষ্ণ মন্দিরের একটি ঘর তাঁকে বিনামূল্যে থাকবার জন্য দিয়েছিলেন। সেই অঞ্চলটির নাম ছিল ছিপিওয়াদা। ছিপিওয়াদার মন্দিরে তাঁর ঘরটিতে ছাদের উপর থেকে ঝোলানো একটি ম্লান আলোর নীচে বসে তিনি দিবারাত্র টাইপ করে যেতেন। তিনি একটি পাতলা মাদুরের উপর বসতেন, আর একটি ট্রাঙ্কের উপর থাকত তাঁর টাইপরাইটার। একটি পাথর চাপা দিয়ে তিনি টাইপ করা কাগজগুলি একদিকে রেখে দিতেন। আহার এবং নিদ্রা প্রায় ছিল না বললেই চলে। তিনি সম্পূর্ণরূপে বিশ্বাস করতেন যে আধুনিক দিগ্‌ভ্রান্ত সমাজে শ্রীমদ্ভাগবত একটি বিপ্লব আনবে। তাই গভীর মনোযোগ আর নিষ্ঠার সঙ্গে তিনি প্রতিটি শব্দের অর্থ ও ভাষ্য রচনা করে চলছিলেন।

ওদিকে বৃন্দাবনেও তিনি তাঁর বাসস্থান পরিবর্তন করেছিলেন। এখন তিনি থাকছিলেন শ্রীশ্রীরাধাদামোদর মন্দিরে, শত শত বছর আগে যেটি ছিল ষড় গোস্বামীর অন্যতম শ্রীজীব গোস্বামীর ভজনের ক্ষেত্র। তিনি সেখানে নিজেই তাঁর রান্না করতেন। প্রসাদ গ্রহণ করার সময় তিনি জাফরি কাটা জানলার মধ্য দিয়ে শ্রীল রূপ গোস্বামীর সমাধি দেখতে পেতেন। শ্রীল রূপ গোস্বামী ছিলেন শ্রীমন্মহাপ্রভুর ধারায় গৌড়ীয় বৈষ্ণব ধর্মের প্রবর্তক। তাই শ্রীল প্রভুপাদ প্রতিদিন তাঁর সমাধির সামনে বসে পথনির্দেশের জন্য প্রার্থনা করতেন। তিনি অনুভব করেছিলেন যে শ্রীরূপ গোস্বামী ও তাঁর পরবর্তী বৈষ্ণব আচার্যেরা যেন তাঁকে আদেশ করছেন যেন তিনি বৃন্দাবন ত্যাগ করে পৃথিবীর বিস্মরণশীল অংশে আচার্যদের বাণী প্রচার করেন।

ক্রমে ক্রমে চাঁদা ও দান সংগ্রহ করে নিজের খরচেই তিনি শ্রীমদ্ভাগবত প্রকাশ করেছিলেন। প্রথম খণ্ডটি প্রকাশের পরে বিভিন্ন মহল থেকে তাঁর গ্রন্থের প্রশংসা আসতে থাকে। যাঁরা প্রশংসা করেছিলেন তাঁদের মধ্যে ছিলেন গোরক্ষপুরের বিখ্যাত গীতা প্রেসের সম্পাদক শ্রীহনুমান প্রসাদ পোদ্দার ও ভারতের প্রাক্তন রাষ্ট্রপতি ডঃ সর্বপল্লী রাধাকৃষ্ণন। সম্মানজনক Adyara Library Bulletin -এ তাঁর গ্রন্থের এক পূর্ণাঙ্গ সমালোচনা বার হয় যাতে মন্তব্য করা হয়েছিল, — "সম্পাদকের এই বিষয়ে গভীর এবং বিস্তৃত জ্ঞান রয়েছে।" প্রথম শ্রেণীর রাজনীতিবিদেরাও তাঁর গ্রন্থ পড়েছিলেন; উত্তর প্রদেশের রাজ্যপাল শ্রীবিশ্বনাথ দাস ও ভারতের উপ-রাষ্ট্রপতি ডঃ জাকির হোসেন গ্রন্থের সন্তোষজনক সমালোচনা করেছিলেন। শ্রীল প্রভুপাদ তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী শ্রীলালবাহাদুর শাস্ত্রীর সঙ্গে দেখা করে তাঁকেও শ্রীমদ্ভাগবতের প্রথম খণ্ডটি উপহার দেন।

শ্রীযুক্ত শাস্ত্রী পরে তাঁকে একটি চিঠিতে লেখেন ঃ **"প্রিয় স্বামীজী, আমাকে শ্রীমদ্ভাগবতের একটি কপি উপহার দেওয়ার জন্য আপনার কাছে আমি সত্যিই কৃতজ্ঞ। আমি উপলব্ধি করছি যে আপনি একটি মূল্যবান কর্ম সম্পাদন করেছেন। সরকারী প্রতিষ্ঠানের গ্রন্থাগারগুলি যদি এটি ক্রয় করে তাহলে খুব ভাল হবে।"**

টাকার অভাব সত্ত্বেও শুধুমাত্র তাঁর অদম্য অধ্যবসায়ের ফলে দু' বছরেরও কম সময়ে তিনি শ্রীমদ্ভাগবতের তিনটি খণ্ড প্রকাশ করতে পেরেছিলেন। এইভাবে তিনি খুব শীঘ্রই তাঁর দেশবাসীদের মধ্যে এবং বিদগ্ধমহলে এক উজ্জ্বল ব্যক্তিত্ব হিসাবে পরিচিত হয়েছিলেন। কিন্তু তাঁর পরিকল্পনা ছিল পাশ্চাত্যে যাওয়ার, কারণ এটাই ছিল তাঁর গুরু-মহারাজের প্রথম ও শেষ নির্দেশ। তৃতীয় খণ্ডটি ছাপা হবার পর তাঁর মনে হয়েছিল তিনি এখন যাবার জন্য প্রস্তুত যদিও তিনি তখন প্রায় কপর্দকহীন এবং তাঁর বয়স তখন উনসত্তর বছর, তবুও তাই তখনই যাত্রা করতে চেয়েছিলেন।

শ্রীকৃষ্ণের কৃপায় তাঁর বিদেশযাত্রার পথে সমস্ত বাধাগুলি একে একে অপসারিত হয়েছিল। মিঃ আগরওয়াল নামে মথুরার এক ব্যবসায়ী স্বতঃপ্রবৃত্ত হয়ে তাঁকে সাহায্য করতে এগিয়ে এসেছিলেন। তাঁর ছেলে গোপাল আমেরিকার পেনসিলভানিয়াতে থাকত। তার সঙ্গে যোগাযোগ করে মিঃ আগরওয়াল শ্রীল প্রভুপাদের মার্কিন দেশে থাকার সমস্ত ব্যবস্থা করেন। এমনকি শ্রীল প্রভুপাদের বিদেশে থাকার সময়ে যা কিছু খরচ সব তিনিই বহন করবেন বলে জানান।

শ্রীল প্রভুপাদ ইতিপূর্বে 'সিন্ধিয়া জাহাজ কোম্পানির' প্রধান শ্রীমতী সুমতি মোরারজীর সান্নিধ্যে এসেছিলেন। শ্রীমতী মোরারজী

তাঁকে শ্রীমদ্ভাগবত ছাপাবার জন্য অর্থ সাহায্য করেছিলেন। এবার শ্রীল প্রভুপাদ শ্রীমতী মোরারজীকে তাঁর জাহাজে আমেরিকা যাত্রার ব্যবস্থা করতে বলেছিলেন। বৃদ্ধ স্বামীজীকে একা একা দূরদেশে যেতে দেবার পক্ষপাতী ছিলেন না শ্রীমতী মোরারজী। বদ্ধমূল ধারণা ছিল যে সেখানে গেলে স্বামীজী ঠাণ্ডায় মারা পড়বেন। কিন্তু শ্রীল প্রভুপাদের জেদের কাছে অবশেষে তাঁকে নতি স্বীকার করতে হয়েছিল। ১৯৬৫ সালের ১৩ই আগস্ট কলকাতা থেকে ছাড়বার জন্য নির্ধারিত তাঁর 'জলদূত' জাহাজে স্বামীজীর জন্য তিনি একটি স্থান সংরক্ষণ করেছিলেন। যাবার আগে শ্রীল প্রভুপাদ মায়াপুরে তাঁর গুরু-মহারাজ শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত ঠাকুরের সমাধি মন্দির দর্শন করে গিয়েছিলেন। যাবার সময় তাঁর গ্রন্থগুলি ছাড়া নিয়েছিলেন একটি সুটকেশ, ছাতা ও কিছু চিঁড়ে-মুড়ি। আমেরিকা যাত্রার জন্য শ্রীল প্রভুপাদের দৃঢ় আত্মপ্রত্যয়ের প্রয়োজন ছিল। প্রবীণ বয়সে তিনি তাঁর পূর্বজীবনের সঙ্গে এক গুরুত্বপূর্ণ বিচ্ছেদ ঘটাতে চলেছিলেন। তিনি যাত্রা করছিলেন এক অপরিচিত দেশে যেখানে তাঁর সমাদৃত হওয়ার সম্ভাবনা ছিল কম। ভারতবর্ষে দরিদ্র এবং অপরিচিত অবস্থায় বাস করা এক জিনিষ, কেননা এই কলিযুগেও ভারতে সন্ন্যাসী ও শাস্ত্রগ্রন্থের সম্মান করা হয়। কিন্তু আমেরিকা সম্পূর্ণ ভিন্ন জায়গা। সেখানে তাঁর কেউ নেই। সেখানে সাধু-সন্ন্যাসীদের কোন ঐতিহ্য নেই, মন্দির নেই, বিনামূল্যে বসবাসযোগ্য আশ্রম নেই। সেখানে তাঁর ভবিষ্যৎ ছিল অনিশ্চিত। কিন্তু তাঁর গুরু-মহারাজের নির্দেশ স্মরণ করে তিনি মনোবল পেতেন। জাহাজে যাত্রার সময়েও শ্রীল প্রভুপাদ অনেক কঠিন পরীক্ষার সম্মুখীন হয়েছিলেন। জাহাজে ওঠার পরের দিনই, অর্থাৎ ১৪ই আগস্ট তাঁর ডায়েরিতে লিখেছিলেন — 'সামুদ্রিক পীড়ায় ভুগছি, মাথা ঘুরছে, বমি হচ্ছে — বঙ্গোপসাগরে

প্রবল বৃষ্টি হচ্ছে। শরীর আরও খারাপ।' ১৯তারিখে জাহাজ কলম্বোয় পৌঁছলে তিনি কিছুটা ভাল হয়েছিলেন। ২০শে আগস্ট ছিল জন্মাষ্টমী। সেদিন তিনি নাবিকদের হরিকথা শুনিয়েছিলেন ও নিজের রান্না করা প্রসাদ তাদের মধ্যে বিতরণ করেছিলেন। ২৩ তারিখের মধ্যেই জাহাজ লোহিত সাগরে এসে পড়ল। সেখানে আবার তাঁকে অনেক অসুবিধা ভোগ করতে হয়েছিল। বৃষ্টিতে সামুদ্রিক পীড়া, মাথাঘোরা, মাথাব্যথা, অরুচি, বমি — তাঁর এই অসুস্থতার লক্ষণগুলির কোনই উপশম হল না। তাঁর বুকের ব্যথাটা এতই প্রবল হয়ে উঠেছিল যে তাঁর মনে হচ্ছিল, যে কোন মুহূর্তেই তাঁর মৃত্যু হতে পারে। দু'দিনে তাঁর দুবার 'হার্ট-অ্যাটাক্' হয়। কিন্তু তাঁর ব্রত, তাঁর অভীষ্ট সিদ্ধির কথা স্মরণ করে তিনি সেই কষ্ট সহ্য করেছিলেন। তিনি বুঝেছিলেন যে আবার এরকম একটি 'অ্যাটাক' হলে তিনি আর তা কাটিয়ে উঠতে পারবেন না। দ্বিতীয় রাত্রে প্রভুপাদ স্বপ্নে দেখেন যে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ একটি নৌকা বাইছেন ও তাঁকে অভয় দিচ্ছেন। প্রভুপাদ উপলব্ধি করেছিলেন যে স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণ তাঁকে রক্ষা করছেন। এরপর আর তাঁর হার্ট অ্যাটাক্ হয়নি, আর জাহাজটিও আশ্চর্যরকম ধীর ও শান্তভাবে যাত্রা সাঙ্গ করে মার্কিন উপকূলে এসে ঠেকেছিল। প্রভুপাদ ডায়েরিতে লিখেছিলেন—'আটলান্টিক যদি তার স্বাভাবিক রূপধারণ করত, তাহলে হয়তো আর বাঁচতাম না। কিন্তু শ্রীকৃষ্ণই ছিলেন জাহাজটির কাণ্ডারী।'

জাহাজটি প্রথমে বোস্টনে থামে। ১৭ই সেপ্টেম্বরের সেই দিনটিতে জড়বাদী পাশ্চাত্যের মাটিতে পা রেখে শ্রীল প্রভুপাদ বুঝেছিলেন যে এখানে ভাগবত-ধর্ম প্রচার সহজ হবে না। কিন্তু শ্রীগুরু ও গৌরাঙ্গের কৃপার উপর তাঁর দৃঢ় আস্থা ছিল। তিনি যে কতটা

নিরহঙ্কার ও শ্রীকৃষ্ণের ওপর নির্ভরশীল ছিলেন, তা তাঁর একটি কবিতা থেকে বোঝা যায়। ১৯৬৫ সালের ১৭ই সেপ্টেম্বর সালের 'মার্কিনে ভগবৎ-ধর্ম' নামে এই কবিতাটিতে তিনি লেখেন ঃ

বড় কৃপা কৈলে কৃষ্ণ অধমের প্রতি।
কি লাগি আনিলে হেথা কর এবে গতি ॥
আছে কিছু কার্য তব এই অনুমানে।
নহে কেন আনিবেন এই উগ্রস্থানে ॥
রজস্তমো গুণে এরা সবাই আচ্ছন্ন।
বাসুদেব কথা রুচি নহে সে প্রসন্ন ॥
কি করে বুঝাবো কথা বর সেই চাহি।

... ...

ক্ষুদ্র আমি দীন-হীন কোন শক্তি নাহি ॥
অথচ এনেছ প্রভু কথা বলিবারে।
যে তোমার ইচ্ছা প্রভু কর এইবারে ॥

১৯শে সেপ্টেম্বর 'জলদূত' বোস্টন থেকে নিউইয়র্কে পৌঁছে ব্রুকলীন বন্দরে নোঙ্গর ফেলল। প্রভুপাদের জাহাজ বাস শেষ হল। জাহাজ থেকে নেমে তিনি যে কোথায় যাবেন, কি করবেন — সে সম্বন্ধে তাঁর কোন ধারণাই ছিল না। তাঁর সম্বল তখন কেবল চল্লিশ টাকা, যা নিউইয়র্কে মাত্র কয়েক ঘন্টার খরচ। আর তাঁর পরণে ছিল ব্রজবাসীর বেশ — কপালে তিলক, পরনে একটি সুতির বর্হির্বাস ও গায়ে চাদর, গলায় কণ্ঠি আর হাতে জপমালা। নিউইয়র্কে কেউ স্বপ্নেও এরকম বৈষ্ণব সন্ন্যাসীকে দেখার কল্পনা করেনি।

তাঁকে নিয়ে পেন্‌সিল্‌ভানিয়ার বাট্‌লারে যাবার জন্য মিঃ গোপাল আগরওয়াল একজন প্রতিনিধিকে পাঠিয়েছিলেন। সেখানকার বাট্‌লার

অঞ্চলে গোপালের পরিবারে তাঁর থাকার ব্যবস্থা হয়েছিল। তিনি সবসময় নিজের রান্না নিজে করতেন। গোপালের আমেরিকান পত্নী স্যালীকে তিনি কিছু সুস্বাদু ভারতীয় রান্না শিখিয়েছিলেন।

২২শে সেপ্টেম্বর 'Butlar Eagle' পত্রিকায় শ্রীল প্রভুপাদ সম্বন্ধে একটি প্রবন্ধ বেরোয়। তাঁর শিরোনামায় ছিলঃ 'অনর্গল ইংরাজিতে হিন্দু সন্ন্যাসীর পাশ্চাত্যে আগমনের উদ্দেশ্য বিশ্লেষণ'। তাঁর একটি ছবিও ছাপা হয়, যাতে তাঁকে সম্বোধন করা হয় 'বৈকুণ্ঠ দূত' বলে। তাঁর দৈনন্দিন অভ্যাসগুলি বর্ণনা করে লেখা হয়েছিল — "**ভক্তিবেদান্ত স্বামী সন্ন্যাসীর জীবন যাপন করেন এবং কোন মহিলাকে তাঁর খাদ্য স্পর্শ করতে দেন না। তিনি সম্পূর্ণরূপে নিরামিষাশী ও পানীয় হিসাবে তিনি কেবল দুধ গ্রহণ করেন।**"

বাট্লার-এ থাকার সময় প্রভুপাদ বিভিন্ন সভায় বক্তৃতা দেন। তিনি 'লায়ন্স ইন্টারন্যাশনাল'-এ এবং Y. M. C. A-তেও ভাষণ দিয়েছিলেন এবং পেন্সিলভানিয়ার 'হারমান' অঞ্চলে 'সেন্ট ফাইভালিস সেমিনারী কলেজে' বক্তৃতা করেছিলেন। তাছাড়া আগরওয়ালদের বাড়িতে যারাই আসত, তাদের সকলের কাছে তিনি ভগবানের কথা প্রচার করতেন। শ্রীল প্রভুপাদ দেখেছিলেন যে আমেরিকায় প্রচারের সম্ভাবনা খুবই উজ্জ্বল। কিন্তু বাট্লারে প্রচারের সুযোগ ছিল সীমিত। কেবলমাত্র দেশ দেখার জন্য এবং সেখানে আয়েশে থাকার জন্য তিনি সেখানে যান নি। সন্ন্যাসী হওয়ায়, কোন আরামপ্রদ গৃহের প্রতি তাঁর আসক্তিও ছিল না। তিনি চেয়েছিলেন ভগবানের বাণী প্রচার করতে, অভূতপূর্ব কিছু করতে। তাই ১৮ই অক্টোবর তিনি বাট্লার ত্যাগ করে নিউইয়র্কের উদ্দেশ্যে যাত্রা করেন।

ফিলাডেলফিয়াতে তিনি পেন্সিল্ভানিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের সংস্কৃতের অধ্যাপক ডঃ নরম্যান ব্রাউনের সঙ্গে দেখা করার আমন্ত্রণ পেয়েছিলেন।

নিউইয়র্কে গিয়ে শ্রীল প্রভুপাদ ডাঃ রামমূর্ত্তি মিশ্র নামে একজন শৌখিন ভারতীয় স্বামীজীর সহায়তায় একটি সম্ভ্রান্ত এলাকায় একটি বাড়িতে একটি ঘর সংগ্রহ করেন। তাঁর মাধ্যমে শ্রীল প্রভুপাদের পরিচয় হয়েছিল পণ্ডিত রবিশঙ্কর ও নৃত্যশিল্পী উদয়শঙ্করের সঙ্গে। ডাঃ মিশ্র যখন প্রভুপাদের সংস্পর্শে আসেন, তখন তাঁর স্বাস্থ্য খুব খারাপ হয়ে পড়েছিল। কিন্তু প্রভুপাদের সঙ্গ প্রভাবে তিনি অচিরেই সুস্থ হয়ে উঠেছিলেন। পরে তিনি বলতেন — "**শ্রীমদ্ ভক্তিবেদান্ত স্বামী প্রভুপাদ তাঁর ভালবাসা দিয়ে আমাকে সম্পূর্ণরূপে জয় করে নিয়েছিলেন। তিনি সত্যিই ছিলেন প্রেমের অবতার। আমার শরীরটি কঙ্কালসার হয়ে গিয়েছিল, কিন্তু তিনি তাঁর অপূর্ব সুন্দর রান্না এবং বিশেষ করে তাঁর ভালবাসা আর ভগবৎ-প্রেমের প্রলেপ দিয়ে আমাকে নবজীবন দান করেছিলেন।**"

কিছুদিন ডাঃ মিশ্রের সঙ্গে থেকে তাঁর ক্লিনিকের লোকেদের কাছে প্রচার করার পর প্রভুপাদ তাঁর ঘরটি ছেড়ে নিচের তলায় একটি ঘরে থাকতে লাগলেন। এটি ছিল একটি ছোট, সংকীর্ণ অফিস ঘর, সেখানে কোনো আসবাবপত্র ছিল না। সেই ঘরের মেঝেতে একটি কম্বল বিছিয়ে তাঁর উপরে প্রভুপাদ বসতেন। তাঁর সামনে থাকত একটি টিনের তোরঙ্গ যেটিকে তিনি লেখার জন্য ডেস্ক্ হিসাবে ব্যবহার করতেন। রাত্রে মেঝেতেই ঘুমাতেন। সেখানে রান্না বা স্নানেরও কোন বন্দোবস্ত ছিল না, তাই রান্না ও স্নানের জন্য প্রতিদিন তাঁকে হেঁটে দূরে এক জায়গায় যেতে হত। তাঁর নিজের

খরচ নিজেকেই চালিয়ে নিতে হচ্ছিল। তাঁর কোন নির্দিষ্ট আয় ছিল না, কিন্তু খরচ ক্রমেই বেড়ে চলেছিল আর শারীরিক সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য অনেক কমে গিয়েছিল।

প্রভুপাদ একবার যখন বাইরে বেরিয়েছিলেন, তখন তাঁর ঘরের দরজা ভেঙে কেউ তাঁর টাইপরাইটার ও টেপরেকর্ডারটি চুরি করে নিয়ে যায়। নিরাপত্তার জন্য তখন তিনি একটি বিকল্প বাসস্থান খুঁজছিলেন। হার্ভে কোহেন্ নামে এক চিত্রশিল্পীর সঙ্গে তাঁর আলাপ হয়েছিল। তার সহায়তায় নিউইয়র্কের বাওরি অঞ্চলে একটি চিলেকোঠার ঘরে তিনি থাকতে পেয়েছিলেন। সেই ঘরে ডেভিড্ অ্যালেন্ নামে আরও একটি ছেলে ছিল।

বাওরি অঞ্চলটি ছিল শহরের সবচেয়ে খারাপ জায়গা। শহরের সম্ভ্রান্ত লোকেরা সচরাচর সেখানে যেত না। তাঁকে সেখানে থাকতে কেউ কেউ নিষেধও করেছিল। প্রভুপাদের বাড়ির দোরগোড়ার একদল মাতাল, নেশাখোর, গৃহহীন-ভবঘুরে পথ জুড়ে ঘুমিয়ে থাকত। প্রভুপাদ কিন্তু কোনদিন তাদের ঘৃণা বা অবজ্ঞা করেন নি।

তাঁর বাড়িতে তিনি ধূপ জ্বালিয়ে সপ্তাহে তিন দিন করে গীতাপাঠ ও কীর্তনের আসর শুরু করেছিলেন, এবং তাঁর কণ্ঠে কীর্তনের সেই মধুর সুরে আকৃষ্ট হয়ে সমাজ-পরিত্যক্ত ছেলেমেয়েরা তাঁর কাছে ভীড় করত; পরে তারা তাঁর সঙ্গে গান গাইত ও বাজনা বাজাতো। পরম দয়াল শ্রীমন্নিত্যানন্দ প্রভু সম্বন্ধে এক বৈষ্ণব কবি গেয়েছিলেন—'**দীন-হীন-পতিত-পামর নাহি বাছে/ ব্রহ্মার দুর্লভ প্রেম সবাকারে যাচে।**' শ্রীল প্রভুপাদের অসামান্য করুণার মধ্যে, তাঁর উদার প্রচার পদ্ধতিতে এই বর্ণনাটি যেন মূর্ত হয়ে উঠেছিল।

এই সময়ে 'Village Voice' নামে একটি পত্রিকায় শ্রীল প্রভুপাদের ছবিসহ একটি প্রবন্ধ বেরোয়। সেই প্রবন্ধে বলা হয়েছিল—'**এ সি ভক্তিবেদান্ত স্বামী এবং তাঁর আমেরিকান অনুগামীদের মাধ্যমে পাশ্চাত্যের সঙ্গে প্রাচ্যের মিলন মূর্ত হয়ে উঠেছে। সত্তর বছর বয়স্ক, সংস্কৃতি সম্পন্ন, উচ্চশিক্ষিত স্বামীজী এদেশে এক বছর ধরে শান্তি ও সৌহার্দ্য সম্বন্ধে উপদেশ দিচ্ছেন।**'

প্রভুপাদ চেয়েছিলেন বাওরিতেই রাধাকৃষ্ণের মন্দির বানাতে। কিন্তু বিপদ এলো অন্য দিক থেকে। ডেভিড অ্যালেন নামে যে ছেলেটি তাঁর ঘরে থাকতো, সে কীর্তন গাইত আর তাঁর উপদেশ মন দিয়ে শুনত। স্বামীজী ডেভিডকে তাঁর প্রথম আমেরিকান শিষ্য করবেন বলে আশা করেছিলেন। কিন্তু তা হবার ছিলনা। বিভিন্ন মাদক দ্রব্যের সাংঘাতিক নেশার দাসত্ব কিছুতেই ছাড়তে পারছিল না সে। ঐ নেশার ঝোঁকে সেও উগ্র হয়ে উঠেছিল। এক এক সময় স্বামীজীকে মারতে যেত। একদিন ঘরে আর কেউ ছিল না, ডেভিড হঠাৎ বিকট হুংকার দিয়ে স্বামীজীর সামনে এসে দাঁড়ালো, তার চোখ দুটো তখন হিংস্র পশুর মত। প্রভুপাদ তাকে বোঝাতে গেলেন, কিন্তু তার তখন কিছুই বোঝার মত অবস্থা ছিলনা। অগত্যা প্রভুপাদ চার তলার সিঁড়ি ভেঙ্গে নেমে এলেন রাস্তায়। নিজের জিনিসপত্র কিছুই তিনি আনতে পারেন নি। আমেরিকায় আসবার ন'মাস পরে তিনি দ্বিতীয়বার আশ্রয় হারিয়ে পথে নামলেন।

এরপর তিনি কি করবেন? একটি পথ খোলা ছিল। তাঁর দেশে ফেরার টিকিট ছিল। তিনি আবার জাহাজে চেপে বসতে পারতেন। কিন্তু সত্তর বছরের বৃদ্ধটি কিছুতেই হার মানবার পাত্র নন। কোন বাধাই তাঁকে তাঁর গুরুদেবের আদেশ পালনে বিরত করতে পারল না।

শ্রীল প্রভুপাদ তখন তাঁর কীর্তনের আসরের দু-চারজন ভক্তের সঙ্গে যোগাযোগ করার চেষ্টা করলেন। এদের মধ্যে একজন ছিল মাইকেল গ্রান্ট, সঙ্গীতশিল্পী হিসাবে তার খানিকটা নাম হয়েছিল। মাইকেল ও আরও কিছু উৎসাহী যুবকেরা মিলে চাঁদা তুলে সেকেণ্ড এভিনিউয়ের একটা খালি দোকানঘর ভাড়া করে ফেলল প্রভুপাদের জন্য। দোকানঘরটার বাইরে একটা সাইনবোর্ডে লেখা ছিল 'Matchles Gifts' বা 'অনুপম উপহার', দোকানঘরের এই নামটি অলৌকিকভাবে সত্য প্রমাণিত হয়েছিল। এখানে আসার পর শ্রীল প্রভুপাদ নিয়মিতভাবে ভগবদ্গীতার উপর যে ভাষণ দিতে লাগলেন তা বাস্তবিকভাবেই ছিল বিশ্ববাসীর প্রতি তাঁর এক অনুপম উপহার। এই ছোট্ট দোকানঘরটিতেই তিনি প্রকৃতপক্ষে কৃষ্ণভাবনামৃত আন্দোলনের সূচনা করেন যা শীঘ্রই বিশ্বকে প্লাবিত করতে চলেছিল। প্রথম থেকেই তাঁর পাঠকীর্তনের আসরে একজন দু'জন করে কৌতূহলী মানুষ জড় হতে থাকে। তারা কৃষ্ণনামের মহা অমৃত আস্বাদন করতে থাকে। তারপর কখন একসময় তাঁকে ঘিরে জনসমুদ্রে হরেকৃষ্ণ মন্ত্রের বড় বড় ঢেউ উঠতে শুরু করে। হাজারে হাজারে, লাখে লাখে মানুষ হরিধ্বনিতে মত্ত হয়ে ওঠে, আমেরিকার মাটিতে হরিনামের বান ডেকে যায়। এক বছরের মধ্যে, ১৯৬৬ সালে মহা-নগরীতে, গড়ে ওঠে আন্তর্জাতিক কৃষ্ণভাবনামৃত সংঘ।

নিউইয়র্কে নথিভুক্ত সংস্থাটিকে শ্রীল প্রভুপাদ কিভাবে বাস্তবে আন্তর্জাতিক রূপ দিলেন সেটি তাঁর জীবনের পরবর্তী দশটি বছরের অবিশ্রান্ত সংগ্রামের কাহিনী। এই সময়ের মধ্যে তিনি চৌদ্দবার গোটা পৃথিবীতে পরিক্রমা করেন এবং পৃথিবীর প্রতিটি মহাদেশে যান।

বিশ্বের সর্বত্র তিনি অক্লান্তভাবে ভগবত্তত্ত্বজ্ঞান সমন্বিত ভাষণ দেন। তাঁর বক্তৃতায় বিশ্বের পণ্ডিত সমাজে বিপুল সাড়া পড়ে যায়। আবার ভ্রমণের এইরকম কঠোর কর্মসূচী থাকা সত্ত্বেও শ্রীল প্রভুপাদ প্রবলভাবে তাঁর লেখার কাজ চালিয়ে যান। বেদ-বেদান্ত মন্থন করা জ্ঞানামৃতের যা সার—সেই গীতা, শ্রীমদ্ভাগবত, পুরাণ, উপনিষদ, চৈতন্যচরিতামৃত ..... ইত্যাদি সব শাস্ত্র একাই সব্যসাচীর মত দক্ষতা সহকারে অনুবাদ করেন — মূল সংস্কৃত থেকে ইংরাজি ভাষায়, বাংলা থেকে ইংরাজিতে, এইভাবে ষাটটিরও অধিক গ্রন্থ তিনি রচনা করেন। পৃথিবীর যেখানেই তিনি গেছেন তাঁর শিষ্যরা তাঁর বসবাসের জন্য রাজকীয় আয়োজন করেছে। তিনি কিন্তু একদিনের জন্যও আরামপ্রদ জীবনকে স্বীকার করেননি। সারা দিন ঘুরে ঘুরে স্বামীজী ভগবৎ-কথা প্রচার করতেন আর রাত্রে তিনি কয়েক ঘন্টা মাত্র ঘুমোতেন। জীবনের শেষ অবধি প্রতিদিন খুব ভোরে দুটো থেকে চারটে পর্যন্ত, যখন অন্য সকলে গভীর নিদ্রায় মগ্ন থাকত, তিনি একলা তাঁর ঘরে বসে কাজ করতেন। শ্রীমদ্ভাগবতের অনুবাদ এবং তাৎপর্য লিখে টাইপ করে তিনি কখন হরিনামের মালা জপ করতেন ও শ্রীকৃষ্ণের আরাধনা করতেন।

১৯৬৬ সালের ৮ই সেপ্টেম্বর জন্মাষ্টমীর পরের দিন তিনি পাশ্চাত্যে প্রথম দীক্ষা অনুষ্ঠানের আয়োজন করেন ও এগারো জনকে দীক্ষা দেন। পরবর্তী দশ বছরে তিনি দশ সহস্রাধিক মানুষকে দীক্ষাদান করেছিলেন। তাঁর দীক্ষিতদের মধ্যে ব্রহ্মচারী ছাড়াও গৃহস্থ দম্পতিও ছিল। এইরকম এক গৃহস্থ দম্পতি— মুকুন্দ ও জানকী সানফ্রানসিস্কো শহরে হরেকৃষ্ণ আন্দোলনের প্রসার করে ও একটি মন্দির স্থাপন করে। ১৯৬৭-এর ৯ই জুলাই সেই শহরের রাজপথে তিনি পাশ্চাত্যের প্রথম রথযাত্রা অনুষ্ঠান পরিচালনা করেন। ক্রমাগত

পরিশ্রমে তাঁর শরীর ভেঙে পড়েছিল বলে ২৫শে জুলাই তিনি ভারতে ফিরে আসেন। ইতিমধ্যে তাঁর আর এক দল শিষ্য লস্ এঞ্জেলেস-এ গিয়ে আরেকটি মন্দির প্রতিষ্ঠা করে। তিনি ভারত থেকে ফিরে এসে মন্দির থেকে মন্দিরে গিয়ে তাঁর শিষ্যদের মধ্যে শক্তি সঞ্চার করতে থাকেন। তাঁর তিন গৃহস্থভক্ত—মুকুন্দ, শ্যামসুন্দর ও গুরুদাসকে তিনি সস্ত্রীক ইংল্যাণ্ডে পাঠান প্রচারের উদ্দেশ্যে। ক্রমে স্বামীজী লণ্ডনে আমন্ত্রিত হলেন। দলে দলে সাংবাদিকরা তাঁর সাক্ষাৎকার নেন ও তাঁর আগমনে ইংল্যাণ্ডে বিপুল সাড়া পড়ে যায়। তিনি লণ্ডনেও মন্দির ও বিগ্রহের প্রতিষ্ঠা করলেন। সমস্ত অনুষ্ঠানটি B.B.C-র দূরদর্শনের মাধ্যমে প্রচারিত হল।

১৯৭০ সালের জুলাই মাসে প্রভুপাদ ইস্কনের প্রকাশনা সংস্থা 'ভক্তিবেদান্ত বুক ট্রাস্ট' স্থাপন করেন। বিভিন্ন ভাষায় শ্রীল প্রভুপাদের গ্রন্থগুলি ছাপানোই এই সংস্থার উদ্দেশ্য। রুশ ও চীনা ভাষা সহ আজ পৃথিবীর পঞ্চাশটিরও বেশী ভাষায় ভক্তিবেদান্ত বুক ট্রাস্ট প্রভুপাদের গ্রন্থগুলি ছাপাচ্ছে।

১৯৭০ থেকে ১৯৭৫ সালের মধ্যে প্রভুপাদ বিশ্বময় ব্যাপকভাবে কৃষ্ণভাবনা প্রচারের উদ্দেশ্যে ভ্রমণ করেন। বিশ্বময় সংঘের মন্দিরগুলির পরিচালনার জন্য তিনি একটি পরিচালক সংস্থা প্রতিষ্ঠা করেন তাঁর প্রধান শিষ্যদের নিয়ে। ১৯৭২ সালে শ্রীল প্রভুপাদ মস্কো বিশ্ববিদ্যালয়ের ভারত-তত্ত্ববিদ্ পণ্ডিত প্রফেসর কটভস্কির আমন্ত্রণে রাশিয়ায় যান। তিনি রাশিয়াতে মাত্র তিন দিন ছিলেন এবং সেই সময়ের মধ্যেই একজনকেই দীক্ষা দিয়েছিলেন। তাঁর রোপিত কৃষ্ণভক্তির সেই বীজ আজ মহীরুহে পরিণত হয়েছে। আজ রুশ দেশগুলিতে হাজার হাজার মানুষ কৃষ্ণভক্তে পরিণত হচ্ছেন। তার পরে তিনি তাঁর শিষ্যদের নিয়ে ভারতের বিভিন্ন স্থানে ভ্রমণ করেন ও অস্ট্রেলিয়া, আফ্রিকা ও ইউরোপের অন্যান্য দেশে প্রচার ও মন্দির প্রতিষ্ঠা করেন।

বিজ্ঞানী ও বিদগ্ধ সমাজে প্রচারের উদ্দেশ্যে ১৯৭৬ সালে শ্রীল প্রভুপাদ তাঁর কতিপয় বৈজ্ঞানিক শিষ্যকে নিয়ে ইস্কনের বিজ্ঞান ও শিক্ষা বিভাগ 'ভক্তিবেদান্ত ইন্‌স্টিটিউট' প্রতিষ্ঠা করেন। এরই মধ্যে বিভিন্ন ষড়যন্ত্র ও মামলার মোকাবিলা করতে হয়েছে তাঁকে। তার মধ্যে সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য হল ১৯৭৭ সালের মার্চ মাসের আমেরিকার একটি আদালতের সিদ্ধান্ত। এই বিচারে ইস্কনের বিরোধীদের যুক্তি নাকচ করে হরেকৃষ্ণ আন্দোলনকে একটি বৈধ ধর্মরূপে স্বীকৃতি দেওয়া হয়।

১৯৭৭ সালের ১৪ নভেম্বর সন্ধ্যা ৭-৩০ মিনিটে শ্রীধাম বৃন্দাবনের কৃষ্ণ-বলরাম মন্দিরে দেহরক্ষা করে ভগবদ্ধামে ফিরে যাওয়ার আগে শ্রীল প্রভুপাদ তাঁর চূড়ান্ত নির্দেশ প্রদান করেন। জগতের যে কল্যাণ সাধন করার জন্য তিনি অবতীর্ণ হয়েছিলেন, আজ তা সম্পূর্ণ হয়েছে। শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত তিনি গম্ভীর, শান্ত, সমাহিত ছিলেন, এবং শিষ্যদের কৃষ্ণোপদেশ দান করেন।

শ্রীল ভক্তিবেদান্ত স্বামী প্রভুপাদ যে কি অসাধারণ এক মহাপুরুষ ছিলেন। তাঁর অবদান যে কতখানি গভীর ও সুদূরপ্রসারী, তা এখনও যথাযথভাবে পরিমাপ করা যায় নি। যত দিন যাবে, তাঁর অসাধারণ মহিমামণ্ডিত চরিত্র আমাদের বিস্ময়ে অভিভূত করবে। তাঁর অসংখ্য সুমহান কীর্তিগুলির যে কোনো একটিও তাঁকে চিরস্মরণীয় করে রাখার পক্ষে যথেষ্ট। শুধুমাত্র তাঁর বৈদিক শাস্ত্রসমূহের সার্থক অনুবাদগুলির জন্যই বিশ্ববাসী তাঁকে ভুলতে পারবে না। আজ পাশ্চাত্যের শতকরা ষাটটি বিশ্ববিদ্যালয়ে তাঁর গ্রন্থগুলি পাঠ্যপুস্তক

হিসাবে নির্ধারিত হয়েছে। সারা বিশ্বের বহু মনীষী সেগুলির ভূয়সী প্রশংসা করেছেন। যেমন তাঁর ভগবদ্গীতার অনুবাদ পড়ে জর্জটাউন বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাষাতত্ত্বের অধ্যাপক শ্রীশালিগ্রাম শুক্লার বক্তব্য ঃ "এটি একটি গভীরভাবে অনুভূত, বলিষ্ঠভাবে প্রকাশিত এবং সুন্দরভাবে বিশ্লেষিত অনুবাদের কাজ। আমি জানি না নির্ভীক অনুবাদের প্রশংসা করব, না এর অন্তহীন ভাবের উর্বরতার প্রশংসা করব। ভগবদ্গীতার অন্য কোনো অনুবাদে আমি এইরকম ভাবের গাম্ভীর্য এবং রচনার মাধুর্য দেখি নি........।

তাঁর গ্রন্থগুলির মতই তাঁর ভাষণগুলির মৌলিকতা, স্বচ্ছ, সরল অথচ নির্ভীক মতামত প্রকাশ করে মানুষকে গভীরভাবে অনুপ্রাণিত করেছে। তাঁর ক্ষুরধার যুক্তির সামনে ধর্মযাজক, সাংবাদিক, দার্শনিক বা বৈজ্ঞানিক সকলকেই হার মানতে হত, কিন্তু তাতে তাদের মনে পরাজয়ের গ্লানি থাকত না। তবে তাঁর বিনয় আর আদর্শ নিষ্ঠাই তাঁকে বিশ্বের পণ্ডিতশ্রেণীর কাছে অসাধারণ করে তুলেছে। বিখ্যাত হারভার্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের ধর্মবিষয়ক অধ্যাপক হারভে কক্স বলেন— "সত্যের বার্তাবাহক হওয়া সত্ত্বেও যে একজন মানুষ তাঁর বৈশিষ্ট্য ও ব্যক্তিত্ব বজায় রাখতে পারে, শ্রীল প্রভুপাদের জীবনী তার একটা অপূর্ব সুন্দর নিদর্শন। ....যে বয়সে অধিকাংশ মানুষ আরামকেদারায় গা এলিয়ে তাদের সাফল্যের স্মৃতিচারণ করে, সেই বয়সে শ্রীল প্রভুপাদ দুর্গম সমুদ্রপথে আমেরিকার উদ্দেশ্যে পাড়ি দেন। শ্রীল প্রভুপাদ হাজার হাজার শিক্ষকের মধ্যে একজন। আবার আর এক দিক দিয়ে দেখতে গেলে হাজার-হাজার, লক্ষ-লক্ষ শিক্ষকের মধ্যেও তাঁর মত একজনকে পাওয়া দুষ্কর।"

আবার ক্যালিফোর্ণিয়ার বার্কলে শহরের 'গ্রাজুয়েট থিওলজিক্যাল ইউনিয়ন এ্যাণ্ড প্যাসিফিক স্কুল অফ্ রিলিজিয়ন'-এর ধর্মীয় ইতিহাসের অধ্যাপক ডঃ জে স্টিলসন জুডার মতে—"অত্যন্ত দৃঢ় নৈতিক বল, গভীর বিনয় এবং পরম পবিত্রতা ছাড়াও তাঁর যে গুণটি মানুষকে সবচাইতে বেশি প্রভাবিত করত, তা হচ্ছে তাঁর বৈরাগ্য। আধুনিক তথাকথিত সমস্ত গুরুদের মতো তিনি নিজেকে অতি উচ্চ এক আসনে বসাবার চেষ্টা করেন নি। পক্ষান্তরে তিনি তাঁর শিষ্যদের সঙ্গে তাদেরই মতো সাদাসিধেভাবে জীবনযাপন করে সন্তুষ্ট ছিলেন। শ্রীল প্রভুপাদের জীবনী হচ্ছে তাঁর আদর্শেরই সংক্ষিপ্ত সার। প্রতারণা আর প্রবঞ্চনাপূর্ণ এই যুগে এইরকম একজন আদর্শ পুরুষেরই প্রয়োজন।"

দেশে ও বিদেশে অসংখ্য বুদ্ধিজীবী শ্রীল প্রভুপাদের জীবনের ও তাঁর কীর্তিসমূহের যে পরিমাণ প্রশস্তি ইতিমধ্যেই করেছেন তা সব এখানে দেওয়া সম্ভব নয়। তাই নির্বাচিত কয়েকজনের বক্তব্যের উদ্ধৃতিই সংকলিত হল।

"দশ বছরেরও কম সময়ের মধ্যে শ্রীল ভক্তিবেদান্ত স্বামী প্রভুপাদ তাঁর ভক্তি, একনিষ্ঠতা, অদম্য শক্তি এবং দক্ষতার দ্বারা আন্তর্জাতিক কৃষ্ণভাবনামৃত সংঘ সংগঠিত করে যেভাবে হাজার-হাজার মানুষকে ভগবদ্ভক্তির মার্গে উদ্বুদ্ধ করেছেন, পৃথিবীর প্রায় সবকটি বড় বড় শহরে রাধাকৃষ্ণের মন্দির প্রতিষ্ঠা করেছেন এবং শ্রীকৃষ্ণ ও শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু প্রদত্ত ভক্তিযোগেব ভিত্তিতে অসংখ্য গ্রন্থ রচনা করেছেন, তা অবিশ্বাস্য।" (প্রফেসর মহেশ মেহেতো, ইউনিভার্সিটি অফ্ উইণ্ডসর, অন্টারিও, কানাডা।)

"শ্রীল প্রভুপাদের বিশাল সাহিত্য সম্ভারের পাণ্ডিত্য এবং নিষ্ঠার মাহাত্ম্য ভাষায় বর্ণনা করা যায় না। শ্রীলপ্রভুপাদের প্রচেষ্টার মাধ্যমে ভবিষ্যতের মানুষ অবশ্যই এক সুন্দরতর পৃথিবীতে বাস করার সুযোগ পাবে। তিনি বিশ্বভ্রাতৃত্ব এবং সমস্ত মানব সমাজের ধর্মীয় ঐক্য প্রতিষ্ঠার মহান প্রতীক।" (ডঃ বিশ্বনাথ শুক্লা, হিন্দীর অধ্যাপক, আলিগড় মুসলিম বিশ্ববিদ্যালয়।)

"পাশ্চাত্যে বসবাসকারী একজন ভারতীয় হিসাবে যখন আমি আমাদের দেশের বহু মানুষকে এখানে এসে ভণ্ড গুরু সেজে বসতে দেখি, তখন আমার খুব খারাপ লাগে। .... সেই কারণে শ্রীল এ. সি. ভক্তিবেদান্ত স্বামী প্রভুপাদের গ্রন্থাবলী পাঠ করে আমি অত্যন্ত উৎসাহিত হয়েছি। সেগুলি 'গুরু' এবং 'যোগী' সম্বন্ধে ভ্রান্ত ধারণা-প্রসূত যে ভয়ংকর প্রবঞ্চনা চলছে, তা বন্ধ করবে আর সমস্ত মানুষকে প্রাচ্য সংস্কৃতির যথার্থ অর্থ হৃদয়ঙ্গম করার সুযোগ দেবে।' (ডঃ কৈলাস বাজপেয়ী, ডিরেক্টর অফ্ ইণ্ডিয়ান স্টাডিজ, মেক্সিকো বিশ্ববিদ্যালয়।)

"মহান পণ্ডিত ও গ্রন্থকার শ্রীমদ্ এ. সি. ভক্তিবেদান্ত স্বামী এক বিশ্ববিখ্যাত মহাপুরুষ এবং আধুনিক জগতের কাছে বৈদিক দর্শনের ব্যবহারিক প্রয়োগের এক মহান পথপ্রদর্শক। ...... পৃথিবীর সবকটি দেশে বৈদিক জীবনধারা ও সনাতন ধর্ম প্রচারে তাঁর অবদানের কোন তুলনা হয় না। স্বামী ভক্তিবেদান্তের মতো গুণী মানুষের দ্বারা যে আজ ভাগবতের বাণী সারা পৃথিবীর মঙ্গলের জন্য প্রচারিত হচ্ছে, সেজন্য আমি তাঁর কাছে অত্যন্ত কৃতজ্ঞ।" (ডঃ আর. কালিয়া, প্রেসিডেন্ট ইণ্ডিয়ান লাইব্রেরি অ্যাসোসিয়েশন্।)

"শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর উত্তরাধিকারীরূপে, ভারতীয় সংস্কৃতির কর্ণধাররূপে, ভক্তিবেদান্ত স্বামী প্রভুপাদ যথার্থভাবেই 'কৃষ্ণকৃপাশ্রীমূর্তি' [His Divine Grace] উপাধি প্রাপ্ত হয়েছেন" (অলিভিয়ার ল্যাকোম্ব, প্যারিস বিশ্ববিদ্যালয়, সর্বোন।)

তবে গ্রন্থগুলি ছাড়াও প্রভুপাদের যে অনন্য অবদান, তা পরিস্ফুট হয়েছে আমাদের কাছের মানুষ, কথা সাহিত্যিক শ্রীসুনীল গঙ্গোপাধ্যায়ের লেখনীর মাধ্যমে — "প্রভুপাদের সমস্ত কেরিয়ারটা স্টাডি করে আমার একটা অদ্ভুত ফিলিং হয়েছে। একজন মানুষ নিজের বিশ্বাসকে আঁকড়ে ধরে এতদূর উঠতে পেরেছেন? আর আমরা কী করছি? ... এই

প্রভুপাদ একলা নিঃসম্বল অবস্থায় এসেছিলেন এদেশে। কিন্তু নিজের স্ট্যাণ্ডপয়েন্ট থেকে এক চুলও নড়েননি। এই মাংসাশী জাতকে ইনি বাধ্য করেছেন নিরামিষ খেতে। এদেশে এত সেক্সুয়াল্ পারমিসিভনেস্, অথচ ইনি ভক্তদের আদেশ দিয়ে রেখেছেন, অবৈধ যৌন সংসর্গ চলবে না। .... এগুলো তো শুধু হুজুগ নয়। আমেরিকান হুজুগ দু-চার মাস, বড় জোর এক বছর থাকে। শুধু হুজুগে এতখানি আত্মত্যাগ কি সম্ভব? সেই তুলনায় আমরা কি করছি? আমরা এদেশে এসেই নিজের নামটা বদলাবার জন্য ব্যস্ত হয়ে পড়ি। ....অথচ ঐ বুড়ো লোকটি পুরো ভারতীয় কালচার চাপিয়ে দিচ্ছে এদেশের হাজার-হাজার ছেলেমেয়েদের মধ্যে।'

এই আপোষহীনতাই প্রভুপাদের বৈশিষ্ট্য ও সাফল্যের চাবিকাঠি। তাঁর আগেও ভারতের কতিপয় প্রচারক পাশ্চাত্যে গিয়েছেন, জ্বালাময়ী বক্তৃতা দিয়ে প্রশংসা কুড়িয়েছেন, কিন্তু পারেননি প্রভুপাদের মতো ম্লেচ্ছ জগতের হাজার-হাজার মানুষকে কদাচার মুক্ত করে তাদের জীবনে এক নতুন গতি দিতে।

উপরে উল্লিখিত মনীষীদের বক্তব্যগুলি অতিস্তুতি বলে মনে হতে পারে, কিন্তু বিশ্বের সর্বত্র প্রভুপাদের অসামান্য প্রভাবের জ্বলন্ত প্রমাণ-স্বরূপ ইসকন সম্প্রদায় সকলের সামনেই রয়েছে।

শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু বলেছিলেন—

পৃথিবীতে আছে যত নগরাদি গ্রাম।
সর্বত্র প্রচার হইবে মোর নাম॥

এত দিনে শ্রীমন্মহাপ্রভুর ঐশী ইচ্ছা পূর্ণ হয়েছে শ্রীল প্রভুপাদের চেষ্টাতেই। ১৯৭৭ সালে তিনি অপ্রকট হয়েছেন। কিন্তু আজও তিনি তাঁর অমৃতময় গ্রন্থের মধ্যে মূর্ত হয়ে আছেন, এবং আমরা জানি যে তাঁর শিক্ষায় অনুপ্রাণিত হয়ে যাঁরা ভগবানের কাছে ফিরে যাওয়ার প্রয়াসী, তাঁদের পথ দেখাবার জন্য তিনি চিরকাল তাঁদের হৃদয়ে বিরাজ করবেন।

বিভিন্ন বিষয়ে শ্রীল প্রভুপাদের আলোকপাত

কৃষ্ণভাবনামৃত আন্দোলনের উদ্দেশ্য

অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ এই কৃষ্ণভাবনামৃত আন্দোলনের উদ্দেশ্য হচ্ছে মানব সমাজকে পারমার্থিক মৃত্যু থেকে রক্ষা করা। বর্তমানে অন্ধ নেতাদের দ্বারা পরিচালিত হয়ে মানব সমাজ বিপথগামী হচ্ছে, কেননা এই সমস্ত নেতারা জানে না মানব জীবনের উদ্দেশ্য কি। মানব জীবনের উদ্দেশ্য হচ্ছে জ্ঞান লাভ করা এবং পরমেশ্বর ভগবানের সঙ্গে আমাদের হারিয়ে যাওয়া সম্পর্কের পুনঃপ্রতিষ্ঠা করা। অথচ সেই কথাটি সকলে ভুলে গেছে। এই কৃষ্ণভাবনামৃত আন্দোলন মানব সমাজকে সেই অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বিষয়টি সম্বন্ধে আলোকদান করার চেষ্টা করছে।

সকলের জন্য এই আন্দোলন

আমরা কোন সংকীর্ণ গোষ্ঠী নই। যে কেউ আমাদের সঙ্গে যোগ দিতে পারে। যেমন বিদ্যালয়ে যে কেউ ভর্তি হতে পারে, তা সে মুসলমান হোক বা খ্রিস্টান হোক বা হিন্দু হোক—তাতে কিছু যায় আসে না।

কৃষ্ণভাবনামৃত এক মহান বিজ্ঞান। দুর্ভাগ্যবশত বিশ্ববিদ্যালয়গুলিতে আজ সেই বিজ্ঞান সম্বন্ধে শিক্ষা দেওয়ার কোন বিভাগ নেই। তাই যে সমস্ত মানুষ মানব সমাজের হিত-সাধনে আগ্রহী, তাদের আমরা আহ্বান জানাই এই আন্দোলনকে জানতে, এবং যদি সম্ভব হয় আমাদের সঙ্গে সহযোগিতা করতে। এই আন্দোলনের মাধ্যমে পৃথিবীর সমস্ত সমস্যার সমাধান হতে পারে।

কিভাবে এই আন্দোলন পৃথিবীর কল্যাণ করছে

এই আন্দোলন মানুষের দুঃখ-দুর্দশার নিবৃত্তি করতে পারে। মানুষ দুঃখ-কষ্ট ভোগ করছে, কেননা তারা ভ্রান্তিবশত তাদের শরীরটাকে তাদের স্বরূপ বলে মনে করছে। আপনি যদি মনে করেন যে আপনার প্রকৃত স্বরূপ হচ্ছে আপনার এই কোট অথবা এই শার্টটি, এবং খুব সাবধানতার সঙ্গে শার্ট এবং কোটটি ধোলাই করেন, কিন্তু শরীরটিকে খাওয়ানো-দাওয়ানোর কথা ভুলে যান, তাহলে কি আপনি সুখী হবেন? তেমনই সকলেই তাদের দেহরূপী শার্ট-কোট পরিষ্কার করছে আত্মাকে বাদ দিয়ে। এই আন্দোলন সেই ভ্রম সংশোধন করে দিয়ে মানুষকে উন্নত চেতনার স্তরে প্রতিষ্ঠিত করছে।

আধুনিক সভ্যতা

আধুনিক সভ্যতা প্রকৃতপক্ষে কিছুই করছে না। কুকুর চার পায়ের ওপর দৌড়াচ্ছে, আর মানুষেরা চার চাকার ওপর দৌড়াচ্ছে—সেটিই কেবল পার্থক্য। আর মানুষ মনে করছে যে চাকার দৌড় অত্যন্ত উন্নত সভ্যতা।

এখন মানুষ মনে করছে যে, সভ্যতা মানে হচ্ছে বড় বড় বাড়ি তৈরি করা। কিন্তু বৈদিক সভ্যতায় বলা হয়েছে যে, সেটা প্রগতি নয়। মানব জীবনের যথার্থ প্রগতি হচ্ছে আত্মজ্ঞান লাভ, অর্থাৎ নিজেকে পূর্ণরূপে জানা।

আসল সমস্যাগুলি কি?

কেউই মরতে চায় না, কিন্তু তবুও মৃত্যু আসে। কেউই বৃদ্ধ হতে চায় না, কিন্তু তবুও বার্ধক্য আসে। কেউই রোগাক্রান্ত হতে চায় না, কিন্তু তবুও অবশ্যম্ভাবীরূপে রোগ আসে। এগুলি হচ্ছে মানব জীবনের প্রকৃত সমস্যা, এবং এগুলির এখনও সমাধান হয়নি। আধুনিক সভ্যতা আহার, নিদ্রা, ভয় এবং মৈথুনের ব্যবস্থাগুলির উন্নতি সাধন করার চেষ্টা করছে, কিন্তু সেগুলি আসল সমস্যা নয়। একজন মানুষ ঘুমায়, একটি কুকুরও ঘুমায়। মানুষের একটা সুন্দর বাসগৃহ রয়েছে বলে সে যে একটা কুকুরের থেকে উন্নত তা নয়।

উভয় ক্ষেত্রেই আসল উদ্দেশ্যটি এক—নিদ্রা। মানুষ আত্মরক্ষার জন্য আণবিক অস্ত্রের উদ্ভাবন করেছে, কিন্তু কুকুরেরও আত্মরক্ষার জন্য দাঁত-নখ রয়েছে। উভয় ক্ষেত্রেই উদ্দেশ্য হচ্ছে আত্মরক্ষা। মানুষ বলতে পারে না যে যেহেতু তার কাছে আণবিক অস্ত্র রয়েছে তাই সে সমস্ত জগৎ অথবা সমস্ত ব্রহ্মাণ্ড জয় করতে পারে। সেটা সম্ভব নয়। মানুষের আহার, নিদ্রা, ভয় এবং মৈথুনের আয়োজনগুলি জটিল এবং চাকচিক্যপূর্ণ হতে পারে, কিন্তু তা বলে তা মানুষকে উন্নত করে না। এই ধরনের উন্নতিকে বড় জোর মার্জিত পাশবিকতা বলা যায়।

ধর্মের সংজ্ঞা ও স্বরূপ

ধর্মও হল বিজ্ঞান, মানুষ ভ্রান্তিবশত ধর্মকে একটা বিশ্বাস বলে মনে করছে। ধর্ম মানে হচ্ছে পরম নিয়ন্তার নির্দেশ পালন করা। তাহলে আপনি খ্রিস্টান হতে পারেন বা আমি হিন্দু হতে পারি, কিন্তু তাতে কিছু যায় আসে না। আমাদের দুজনকেই স্বীকার করতে হবে যে একজন পরম নিয়ন্তা আছেন।

জাতিভেদ প্রথা

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতায় কোথায় জাতিভেদ প্রথার উল্লেখ রয়েছে? শ্রীকৃষ্ণ বলেছেন, 'চাতুর্বর্ণ্যং ময়া সৃষ্টং গুণকর্মবিভাগশঃ'—"গুণ এবং কর্ম অনুসারে আমি চারটি বর্ণ সৃষ্টি করেছি।" *(গীতা ৪/১৩)* যেমন, আমরা দেখতে পাই যে সমাজে ইঞ্জিনীয়ার রয়েছে, আবার ডাক্তারও রয়েছে। আপনি কি বলবেন যে তারা বিভিন্ন জাতির অন্তর্ভুক্ত? না। কোন মানুষ যদি ডাক্তারী শিক্ষাপ্রাপ্ত হয়, তাহলে তাকে ডাক্তার বলে স্বীকৃতি দেওয়া হয়; আর কেউ যখন ইঞ্জিনীয়ারিং শিক্ষাপ্রাপ্ত হয়, তখন তাকে ইঞ্জিনীয়ার বলে স্বীকার করা হয়। তেমনই, শ্রীমদ্ভগবদ্গীতায় সমাজের মানুষকে চারটি শ্রেণীতে বিভক্ত করা হয়েছে—অত্যন্ত উন্নত বুদ্ধিমত্তাসম্পন্ন মানুষ, পরিচালক শ্রেণীর মানুষ, উৎপাদক শ্রেণীর মানুষ এবং সাধারণ শ্রমিক। এই শ্রেণীবিভাগ স্বাভাবিক।

আমরা জাতিভেদ প্রথা প্রচলন করছি না, যে প্রথায় পাষণ্ড মানুষেরাও ব্রাহ্মণ পরিবারে জন্মগ্রহণ করেছে বলে আপনা থেকে ব্রাহ্মণ হয়ে যায়। তার আচার-আচরণগুলি হয়ত সবচাইতে নিকৃষ্ট স্তরের মানুষদের মতো, অথচ ব্রাহ্মণ পরিবারে জন্মগ্রহণ করেছে বলে তাকে যদি সর্বোৎকৃষ্ট শ্রেণীভুক্ত বলে স্বীকৃতি দেওয়া হয় তাহলে সমাজের সর্বনাশ হবে। সেই প্রথা আমরা স্বীকার করি না। যে মানুষ গুণগতভাবে ব্রাহ্মণত্ব অর্জন করেছে, তাকেই আমরা সর্বোৎকৃষ্ট স্তরের মানুষ বলে স্বীকৃতি দিই, তা সে ভারতীয়ই হোক্, ইউরোপীয়ান হোক অথবা আমেরিকান হোক; উচ্চ কুলোদ্ভূত হোক অথবা নিম্নকুলোদ্ভূত হোক, তাতে কিছু যায় আসে না।

স্ত্রী-স্বাধীনতা

তথাকথিত স্ত্রী-স্বাধীনতা হচ্ছে স্ত্রীলোকদের প্রতারণা করার কৌশল। ভেবে দেখুন, একটি স্ত্রীর সঙ্গে একটি পুরুষের সাক্ষাৎ হল, তারা পরস্পরের প্রতি আসক্ত হল, তাদের যৌন-সঙ্গম হল, মেয়েটি তখন গর্ভবতী হল, আর মেয়েটিকে উপভোগ করার পর ছেলেটি তাকে পরিত্যাগ করে চলে গেল। মেয়েটিকে তখন শিশুটির ভরণ-পোষণ করতে হয় এবং সরকারের কাছ থেকে হাত পেতে ভিক্ষাগ্রহণ করতে হয়, অথবা তার গর্ভের সন্তানটিকে নষ্ট করতে হয়। এটাই হচ্ছে স্ত্রী-স্বাধীনতা। তাহলে আসল স্বাধীনতাটি কোথায়—স্বামীর তত্ত্বাবধানে থাকা, না পাঁচজনের ভোগের সামগ্রী হওয়া?

পারমার্থিক জীবনে আমরা স্ত্রী-পুরুষের মধ্যে বিভেদ দর্শন করি না। আমরা স্ত্রী এবং পুরুষকে সমানভাবে কৃষ্ণভাবনা দান করি। আমরা স্ত্রী, পুরুষ, ধনী, দরিদ্র সকলকেই স্বাগত জানাই।

খ্রিস্টানদের প্রতি

কৃষ্ণ অথবা খ্রিস্ট—তাতে কিছু যায় আসে না, নাম একই। তবে আসল কথা হচ্ছে বৈদিক শাস্ত্রের নির্দেশ অনুসারে এই কলিযুগে জড় বন্ধন থেকে মুক্তির একমাত্র উপায় স্বরূপ ভগবানের নাম কীর্তন করতে হবে।

খ্রিস্টান ধর্মে প্রথমেই নির্দেশ দেওয়া হয়েছে, "তুমি কাউকে হত্যা করবে না' (Thou shalt not kill)। অথচ সারা পৃথিবী জুড়ে খ্রিস্টানরা কসাইখানায় অসংখ্য প্রাণী হত্যা করছে। খ্রিস্টানরা যদি ভগবানকে ভালবাসতে চায়, তাহলে তাদের পশুহত্যা থেকে নিরস্ত হতে হবে।

আমি মনে করি, খ্রিস্টান ধর্মযাজকদের এই হরেকৃষ্ণ আন্দোলনে আমাদের সহযোগিতা করা উচিত। তাদের কৃষ্ণ বা খ্রিস্ট নাম কীর্তন করা উচিত এবং পশুহত্যা বন্ধ করা উচিত। এটাই বাইবেলের শিক্ষা, এটা আমার মনগড়া কথা নয়। দয়া করে এই নির্দেশ অনুসরণ করে চলুন, দেখবেন সারা বিশ্বের কি সুন্দর পরিবর্তন হয়েছে।

সাম্প্রদায়িকতার ঊর্ধ্বে

সবকটি ধর্মেরই সারমর্ম হচ্ছে এক। আমাদের বক্তব্য হচ্ছে আপনি যে ধর্মই আচরণ করুন না কেন, ভগবানকে জানবার চেষ্টা করুন এবং তাঁকে ভালবাসতে চেষ্টা করুন। যদি আপনি খ্রিস্টান হন, তাহলে আমরা বলি না—"এই ধর্ম ভাল নয়, আপনাকে আমাদের মত হতে হবে।" আমাদের বক্তব্য হচ্ছে আপনি খ্রিস্টান হোন, মুসলমান হোন বা হিন্দু হোন, কেবল ভগবানকে জানার চেষ্টা করুন এবং তাঁকে ভালবাসুন। ...... ভক্তিযোগ অনুশীলন করার উদ্দেশ্য হচ্ছে হিন্দু, মুসলমান, খ্রিস্টান প্রভৃতি সবরকম উপাধি থেকে মুক্ত হয়ে কেবলমাত্র ভগবানের সেবায় নিযুক্ত হওয়া। হিন্দু, মুসলমান, খ্রিস্টান ইত্যাদি ধর্মগুলো তো আমরা সৃষ্টি করেছি, কিন্তু এই সমস্ত উপাধিবিমুক্ত যে ধর্ম, যাতে আমরা হিন্দু নই, মুসলমান নই, খ্রিস্টান নই, সেই ধর্মই হচ্ছে শাশ্বত, সনাতন ধর্ম বা ভগবদ্ভক্তি।

গুরু কে?

গুরু হচ্ছেন শ্রীকৃষ্ণের প্রতিনিধি, পূর্বতন আচার্যদের প্রতিনিধি। কৃষ্ণ বলেছেন যে, সমস্ত আচার্যেরা হচ্ছেন তাঁর প্রতিনিধি। তাই গুরুকে ভগবানেরই মতো সম্মান প্রদর্শন করতে হয়। কিন্তু গুরুদেব কখনও বলেন না, "আমি ভগবান"।

আমরা যখন একটি টেলিগ্রাম পাঠাই, তখন সেই টেলিগ্রামবাহক পিওনটি সেই টেলিগ্রামের পরিবর্তন করে না, ভুল সংশোধন করে না, অথবা তাতে নতুন কোন কথা জোড়ে না। সে কেবল সেটি নির্দিষ্ট স্থানে পৌঁছে দেয়। গুরুর কাজও হচ্ছে তেমনি। বিভিন্ন ব্যক্তি গুরু হতে পারেন, কিন্তু তাঁদের বাণী এক। তাই বলা হয় যে গুরু এক।

গুরুর সন্ধান করা খুবই ভাল, কিন্তু আপনি যদি একজন সস্তা গুরু চান, অথবা আপনি যদি প্রতারিত হতে চান, তাহলে আপনি অনেক প্রতারক গুরু পাবেন। যেহেতু মানুষ সবকিছুই খুব সস্তায় পেতে চায়, তাই তারা প্রতারিত হচ্ছে। আমরা আমাদের শিষ্যদের অবৈধ স্ত্রীসঙ্গ, মাংসাহার, জুয়াখেলা এবং মাদকদ্রব্য বর্জন করতে নির্দেশ দিই। মানুষ মনে করে যে সেটা ভীষণ কঠিন—একটা অনর্থক ঝামেলা। কিন্তু কেউ যদি এসে বলে, "তোমরা যত সমস্ত অপকর্ম করে চলেছ সেগুলি সব করে যাও, কেবল আমার কাছে মন্ত্র নাও।" তাহলে মানুষ তাকে খুব পছন্দ করবে।

দীক্ষিত হতে হলে কি কি বর্জনীয়?

সর্বপ্রথমে আপনাকে অবৈধ স্ত্রী-সঙ্গ বর্জন করতে হবে। অবৈধ স্ত্রী-সঙ্গ মানে হচ্ছে বিবাহ-বহির্ভূত স্ত্রীসঙ্গ।... আপনাকে সবরকমের মাদক দ্রব্য ত্যাগ করতে হবে, এমনকি চা, সিগারেট, মদ, গাঁজা—যা কিছু মাদকতা সৃষ্টি করে। আপনাকে মাছ, মাংস, ডিম ইত্যাদি আমিষ আহারও বর্জন করতে হবে। আর আপনাকে জুয়া, তাস, পাশা ইত্যাদি অবৈধ ক্রীড়া বর্জন করতে হবে। আপনি যদি এই চার রকম কার্য বর্জন না করেন, তাহলে আপনি দীক্ষা গ্রহণ করতে পারেন না। আপনাকে কেবল আপনার খারাপ অভ্যাসগুলি ছেড়ে দিয়ে জপমালায় 'হরেকৃষ্ণ মহামন্ত্র' জপ করতে হবে, কেবল এইটুকু করলেই হবে।

শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু ও তাঁকে আরাধনার পন্থা

এই যুগের অবতার হচ্ছেন শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু, বৈদিক শাস্ত্রে তা বর্ণনা করা হয়েছে। আমরা শাস্ত্র-প্রমাণ ব্যতীত যাকে-তাকে অবতার বলে স্বীকার

আকর তালিকা

১) ১৯৮৩ সালের ২৭শে এপ্রিল যুগান্তরে প্রকাশিত শ্রীঅমিতাভ চৌধুরী কৃত 'শ্রীল প্রভুপাদ লীলামৃত' (২য় খণ্ড) এর সমালোচনা দ্রষ্টব্য। 'ভগবৎ দর্শন' (এপ্রিল, ১৯৮৫)-এ উদ্ধৃত।

২) 'মানবসাগর তীরে' পরিচ্ছেদ ২৩—শংকর (রবিবাসরীয় আনন্দবাজার পত্রিকা, ২১ জুলাই, ৯১, পৃঃ - ১২ দ্রষ্টব্য)

৩) 'বাঙালের আমেরিকা দর্শন': শীর্ষেন্দু মুখোপাধ্যায় (রবিবাসরীয় আনন্দবাজার পত্রিকায় প্রকাশিত)

৪) 'পূর্ব পশ্চিম'— সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়, উপসংহার - ২ (ধারাবাহিকভাবে সাপ্তাহিক 'দেশ' পত্রিকায় প্রকাশিত, ১৮৭তম কিস্তি, ১৭ ডিসেম্বর ১৯৮৮)

৫) 'নিত্য ধর্ম সূর্যোদয়' ('সজ্জন তোষণী' পত্রিকা ৪/৩) — শ্রীযুক্ত কেদারনাথ দত্ত (শ্রীল সচ্চিদানন্দ ভক্তিবিনোদ ঠাকুর)

৬) এই অংশ থেকে শ্রীল প্রভুপাদের জীবনী পরিবেশনে ভিত্তিরূপে ব্যবহৃত হয়েছে 'প্রভুপাদ' গ্রন্থটি, লেখক শ্রীমদ্ সৎস্বরূপ দাস গোস্বামী, বঙ্গানুবাদ শ্রীমদ্ ভক্তিচারু স্বামী, ১ম সংস্করণ (১৯৮৫) ভক্তিবেদান্ত বুক ট্রাস্ট, কলকাতা। অন্য গ্রন্থ ব্যবহৃত হলে তার উল্লেখ থাকবে।

৭) শ্রীশ্রীগুর্বষ্টকম্ — শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্তী ঠাকুর। এই গুরু-বন্দনাটির ৩য় শ্লোকে আছে—**শ্রীবিগ্রহারাধন-নিত্য-নানা-শৃঙ্গার-তন্মন্দির-মার্জনাদৌ। যুক্তস্য ভক্তাংশ্চ নিযুঞ্জতোঽপি বন্দে গুরোঃ শ্রীচরণারবিন্দম্।।'** অর্থাৎ যিনি শ্রীবিগ্রহের আরাধনা ও শ্রীমন্দির মার্জনাদি সেবা করেন, সেই শ্রীগুরুদেবের পাদপদ্ম বন্দনা করি।

৮) 'গুরুভক্তি' (প্রবন্ধ)—শ্রীসঙ্কর্ষণ দাস ('ভগবৎ দর্শন' পত্রিকা, ডিসেম্বর ১৯৯০, পৃঃ - ১৩)

৯) ঐ - পৃঃ ১৪ শ্রীল প্রভুপাদের সঙ্গে তাঁর গুরু-মহারাজের প্রথম সাক্ষাতের কিছু বিবরণ এই প্রবন্ধটি থেকে নেওয়া হয়েছে।

১০) শ্রীল প্রভুপাদ কমিক্ — বিজয় গোবিন্দ দাস সম্পাদিত, বঙ্গানুবাদ শ্রীমদ্ সুভগ স্বামী, ভক্তিবেদান্ত ইনস্টিটিউট, বম্বে কর্তৃক প্রকাশিত, পৃ- ৮

১১) 'ভক্তিকথা' — শ্রীমদ্ এ সি ভক্তিবেদান্ত স্বামী প্রভুপাদ, অধ্যায় ৩ 'শিক্ষানীতি প্রসঙ্গে ডাঃ এম. এস. আনের মতবাদ' শীর্ষক প্রবন্ধ, পৃঃ - ২০ (ভক্তিবেদান্ত বুক ট্রাস্ট), প্রথম প্রকাশিত - 'গৌড়ীয় পত্রিকা'

১২) 'শ্রীল প্রভুপাদ' কমিক্, পৃঃ - ১১

১৩) 'বৃন্দাবনে ভজন'—২য় চরণ—অর্থহীন দেখি মোরে ছেড়েছে সবাই। কুটুম্ব, আত্মীয় আর বন্ধুজন ভাই।। দুঃখ হয় হাসি পায়, একা বসে হাসি। আমার সংসার এই কাকে ভালবাসি।। কোথা গেল মাতা পিতা আর স্নেহময় ? কোথা গেল জ্যেষ্ঠ যারা স্বজনাদি হয়।। তাদের খবর কেবা দেবে মোরে বল। নাম মাত্র তাদের সংসারে রয়ে গেল।।

১৪) 'শ্রীল প্রভুপাদ' কমিক্, পৃঃ - ১৪

১৫) শ্রীল প্রভুপাদ জানতেন না আমেরিকায় তিনি কি খাদ্য পাবেন। হয়তো সেখানে কেবল মাংসই পাওয়া যায়। তাই তিনি সঙ্গে আলুসিদ্ধ ও শুকনো খাদ্যশস্যাদি নিয়েছিলেন ('প্রভুপাদ', পৃঃ দ্রষ্টব্য)

১৬) 'মার্কিনে ভাগবৎ ধর্ম' - 'প্রভুপাদ', ১ম অধ্যায়, 'একক সংগ্রাম', পৃঃ - ৩ দ্রষ্টব্য)

১৭) ডঃ মিশ্রের একজন ছাত্র প্রভুপাদকে শ্রদ্ধাবশত টেপ-রেকর্ডারটি দিয়েছিল।

১৮) **নিতাই গুণমণি আমার, নিতাই গুণমণি** (শ্রীনিত্যানন্দের গুণ বর্ণনামূলক পদ) — লোচনদাস ঠাকুর।

১৯) এই অংশের বর্ণনাটি শ্রীসুনীল গঙ্গোপাধ্যায়ের 'পূর্ব পশ্চিম' থেকে গৃহীত।

২০) এই বর্ণনাটি 'ভগবানের কথা' শ্রীমদ্ ভক্তিবেদান্ত স্বামী প্রভুপাদ গ্রন্থের 'প্রস্তাবনা' থেকে গৃহীত।

২১) ১৯৭২ সালে তিনি প্রথম 'গুরুকুল' (ইসকনের প্রাথমিক ও মাধ্যমিক শিক্ষার প্রতিষ্ঠান) প্রতিষ্ঠা করেন বৈদিক যুগের গুরুগৃহের আদর্শে। আজকে বিশ্বব্যাপী অনেক গুরুকুল বিদ্যালয় রয়েছে ও হাজার হাজার শিক্ষার্থী সেখানে বৈদিক পারমার্থিক জ্ঞানলাভ করছে।

২২) 'পূর্ব পশ্চিম'—শ্রীসুনীল গঙ্গোপাধ্যায়, (সিদ্ধার্থের বক্তব্য)।

শ্রীল প্রভুপাদের গ্রন্থাবলীর প্রশংসা

আত্ম-উপলব্ধি সম্বন্ধে ভারতের অন্তহীন বিজ্ঞান পাশ্চাত্য জগতে নিয়ে আসার জন্য বহু মনীষী বিগত কয়েক বছর ধরে শ্রীল প্রভুপাদের লেখার ভূয়সী প্রশংসা করেছেন।

"শ্রীমদ্ এ. সি. ভক্তিবেদান্ত স্বামী প্রভুপাদ এক অমূল্য কর্তব্য সম্পাদন করেছেন। মানব সমাজের মুক্তির জন্য তাঁর রচিত গ্রন্থগুলি এক অনবদ্য অবদান।"

শ্রীলালবাহাদুর শাস্ত্রী
ভারতের প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী

"ভারতের যোগীদের প্রদত্ত ধর্মের বিবিধ পন্থার মধ্যে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর দশম অধঃস্তন শ্রীল ভক্তিবেদান্ত স্বামী প্রভুপাদ প্রদত্ত কৃষ্ণভাবনামৃতের পন্থা হচ্ছে সবচাইতে বৈশিষ্ট্যপূর্ণ। দশ বছরেরও কম সময়ের মধ্যে শ্রীল ভক্তিবেদান্ত স্বামী তাঁর ব্যক্তিগত ভক্তি, একনিষ্ঠতা, অদম্য শক্তি এবং দক্ষতার দ্বারা আন্তর্জাতিক কৃষ্ণভাবনামৃত সংঘ সংগঠন করে যেভাবে হাজার হাজার মানুষকে ভগবদ্ভক্তির মার্গে উদ্বুদ্ধ করেছেন, পৃথিবীর প্রায় সব কটি বড় বড় শহরে রাধাকৃষ্ণের মন্দির প্রতিষ্ঠা করেছেন এবং শ্রীকৃষ্ণ ও শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু প্রদত্ত ভক্তিযোগের ভিত্তিতে অসংখ্য গ্রন্থ রচনা করেছেন, তা অবিশ্বাস্য।"

প্রফেসর মহেশ মেহতা
প্রফেসর অব্ এশিয়ান স্টাডিস্,
ইউনিভার্সিটি অব্ উইণ্ডসর,
অন্টারিও, কানাডা

"এ. সি. ভক্তিবেদান্ত স্বামী প্রভুপাদ হচ্ছেন একজন অত্যন্ত বর্ষিষ্ণু আচার্য এবং এক মহান সংস্কৃতির উত্তরাধিকারী।"

জোসেফ জিন লানজো ডেলভাস্টো
বিখ্যাত ফরাসী দার্শনিক এবং সাহিত্যিক

"শ্রীল প্রভুপাদের বিশাল সাহিত্য-সম্ভারের পাণ্ডিত্য এবং নিষ্ঠার মাহাত্ম্য ভাষায় বর্ণনা করা যায় না। শ্রীল প্রভুপাদের প্রচেষ্টার মাধ্যমে ভবিষ্যতের মানুষেরা অবশ্যই এক সুন্দরতর পৃথিবীতে বাস করার সুযোগ পাবে। তিনি বিশ্বভ্রাতৃত্ব এবং সমস্ত মানব সমাজের ধর্মীয় ঐক্য প্রতিষ্ঠার মহান প্রতীক। ভারতবর্ষের বাইরের জগৎ,

বিশেষ করে, পাশ্চাত্য জগৎ শ্রীল প্রভুপাদের কাছে গভীরভাবে কৃতজ্ঞ। কেননা তিনি অত্যন্ত বিজ্ঞানসম্মতভাবে তাদের ভারতের কৃষ্ণভক্তির শ্রেষ্ঠ সম্পদ প্রদান করেছেন।"

শ্রীবিশ্বনাথ শুক্লা. পি-এইচ. ডি
প্রফেসর অব্ হিন্দি,
এম, ইউ, আলিগড়,
উত্তরপ্রদেশ

"পাশ্চাত্যে বসবাসকারী একজন ভারতীয় হিসাবে যখন আমি আমাদের দেশের বহু মানুষকে এখানে এসে ভণ্ড গুরু সেজে বসতে দেখি, তখন আমার খুব খারাপ লাগে। পাশ্চাত্যে যেমন যে কোন এক সাধারণ মানুষ তার জন্ম থেকেই খ্রীস্টান সংস্কৃতির সঙ্গে পরিচিত হয়, ভারতবর্ষেও একজন সাধারণ মানুষ তেমনি তার জন্ম থেকেই ধ্যান এবং যোগের তত্ত্বের সঙ্গে পরিচিত হয়। দুর্ভাগ্যবশত, বর্তমানে বহু অসৎ লোক ভারতবর্ষ থেকে এখানে এসে যোগ সম্বন্ধে তাদের ভ্রান্ত ধারণা প্রদর্শন করে মন্ত্র দেওয়ার নামে লোক ঠকাচ্ছে এবং নিজেদের ভগবানের অবতার বলে প্রচার করছে। এই ধরনের অনেক প্রবঞ্চক তাদের অন্ধ অনুগামীদের এমনভাবে প্রবঞ্চনা করছে যে ভারতীয় সংস্কৃতি সম্বন্ধে যাদেরই একটু জ্ঞান আছে তারাই অত্যন্ত উদ্বিগ্ন হয়ে পড়ছেন। সেই কারণে শ্রীল এ. সি. ভক্তিবেদান্ত স্বামী প্রভুপাদের প্রকাশিত গ্রন্থাবলী পাঠ করে আমি অত্যন্ত উৎসাহিত হয়েছি। সেগুলি 'গুরু' এবং 'যোগী' সম্বন্ধে ভ্রান্ত ধারণাপ্রসূত যে ভয়ঙ্কর প্রবঞ্চনা চলছে, তা বন্ধ করবে এবং সমস্ত মানুষকে প্রাচ্য সংস্কৃতির যথার্থ অর্থ হৃদয়ঙ্গম করার সুযোগ দেবে।"

ডঃ কৈলাস বাজপেয়ী
ডাইরেক্টর অব্ ইণ্ডিয়ান স্টাডিস
সেন্টার ফর ওরিয়েন্টাল স্টাডিস্
দি ইউনিভার্সিটি অব্ মেক্সিকো

"এ. সি. ভক্তিবেদান্ত স্বামী প্রভুপাদের রচিত গ্রন্থগুলি কেবল সুন্দরই নয়, তা বর্তমান যুগের পক্ষে অত্যন্ত প্রাসঙ্গিক, বিশেষ করে যখন সমগ্র জাতিই জীবনের আসল উদ্দেশ্য সম্পাদনের জন্য এক সাংস্কৃতিক পন্থা খুঁজছে।"

ডঃ সি. এল. শ্প্রেডবারি
প্রফেসর অব্ সোসিওলজি,
স্টিফেন এফ অস্টিন স্টেট ইউনিভার্সিটি

"ভক্তিবেদান্ত বুক ট্রাস্টের প্রকাশিত বই পরীক্ষা করে দেখার সুযোগ পেয়ে আমি নিজেকে ধন্য বলে মনে করছি: এই গ্রন্থগুলি শিক্ষায়তন এবং পাঠাগারগুলির জন্য এক অমূল্য সম্পদ। ভারতীয় দর্শন এবং সংস্কৃতির প্রতিটি অধ্যাপক এবং ছাত্রদের কাছে আমি বিশেষভাবে সুপারিশ করব শ্রীমদ্ভাগবত পাঠ করার জন্য। মহান পণ্ডিত ও গ্রন্থকার শ্রীমদ্ এ. সি. ভক্তিবেদান্ত স্বামী হচ্ছেন এক বিশ্ববিখ্যাত মহাপুরুষ এবং আধুনিক জগতের কাছে বৈদিক দর্শনের ব্যবহারিক প্রয়োগের এক মহান পথ-প্রদর্শক। বৈদিক জ্ঞান অধ্যয়ন করার জন্য সারা পৃথিবী জুড়ে তিনি একশ'টিরও অধিক পারমার্থিক আশ্রম প্রতিষ্ঠা করেছেন। পৃথিবীর সব কটি দেশে বৈদিক জীবনধারা ও সনাতন ধর্ম প্রচারে তাঁর অবদানের কোন তুলনা হয় না। স্বামী ভক্তিবেদান্তের মতো গুণী মানুষের দ্বারা যে আজ ভাগবতের বাণী সারা পৃথিবীর মঙ্গলের জন্য প্রচারিত হচ্ছে সেজন্য আমি তাঁর কাছে অত্যন্ত কৃতজ্ঞ।"

ডঃ আর কালিয়া
প্রেসিডেন্ট
ইণ্ডিয়ান লাইব্রেরী অ্যাসোসিয়েশন্

"বৈদিক শাস্ত্রের ইংরাজী অনুবাদ এবং ভাষ্য রচনা করে স্বামী ভক্তিবেদান্ত ভগবদ্ভক্তদের উদ্দেশ্যে এক মহান কর্তব্য সম্পাদন করেছেন। এই তত্ত্ব-দর্শনের বিশ্বজনীন প্রয়োগ আজকের দুর্দশাগ্রস্ত জগতে এক আশীর্বাণী বহন করে এনে এই জ্ঞানের আলোকে অজ্ঞানতার অন্ধকার দূর করেছে। প্রকৃতই এ এক মহান অনুপ্রেরণাপ্রসূত রচনা যা প্রতিটি অনুসন্ধিৎসু মানুষের জীবন সম্বন্ধে 'কেন', 'কবে' এবং 'কোথায়' প্রভৃতি অনুসন্ধানের সন্ধান দেবে।"

ডঃ জুডিথ এম টাইবার্গ
ফাউণ্ডার এণ্ড ডিরেক্টর
ইস্ট-ওয়েস্ট কালচারাল সেন্টার
লস্ এঞ্জেলেস, ক্যালিফোর্নিয়া

"...শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর উত্তরাধিকারীরূপে, ভারতীয় সংস্কৃতির কর্ণধাররূপে ভক্তিবেদান্ত স্বামী প্রভুপাদ যথার্থভাবেই 'কৃষ্ণকৃপাশ্রীমূর্তি' (His Divine Grace) উপাধি প্রাপ্ত হয়েছেন। স্বামী প্রভুপাদ সংস্কৃত ভাষার উপর পরিপূর্ণ দখল অর্জন করেছেন। আমাদের কাছে তাঁর ভগবদ্গীতা মহান অনুপ্রেরণা নিয়ে এসেছে, কেননা তা হচ্ছে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর ভগবদ্গীতার প্রামাণিক বিশ্লেষণ। একজন খ্রীস্টান দার্শনিক এবং ভারত-তত্ত্ববিদের এই প্রশস্তি হচ্ছে ঐকান্তিক বন্ধুত্বের অভিব্যক্তি।"

অলিভিয়ার ল্যাকোম্ব
প্রফেসর, ইউনিভার্সিটি দ্য প্যারিস, সর্বোন
ভূতপূর্ব ডিরেক্টর, ইনস্টিটিউট অব্ ইণ্ডিয়ান সিভিলাইজেশন

"আমি গভীর উৎসাহ, মনোযোগ এবং সাবধানতার সঙ্গে শ্রীল ভক্তিবেদান্ত স্বামীর গ্রন্থগুলি পাঠ করেছি এবং দেখেছি যে ভারতের পারমার্থিক এবং সাংস্কৃতিক সম্পদ সম্বন্ধে উৎসাহী যে কোন মানুষের কাছে সেগুলির মূল্য অপরিসীম। এই গ্রন্থের গ্রন্থকার গ্রন্থের প্রতিটি পৃষ্ঠায় সেই বিষয় সম্বন্ধে তাঁর অগাধ পাণ্ডিত্যের নিদর্শন দিয়ে গেছেন। বৈষ্ণব দর্শনের কঠোর নিয়মানুবর্তিতার মধ্যে প্রতিপালিত হওয়া সত্ত্বেও যে সহজ এবং সাবলীল ভঙ্গীতে তিনি অত্যন্ত জটিল ভাবধারাগুলি বর্ণনা করেছেন, তা থেকে সহজেই বোঝা যায় যে তিনি সম্পূর্ণরূপে তার মর্ম উপলব্ধি করেছেন। তিনি অবশ্যই সেই পারমার্থিক জ্ঞানের সর্বোচ্চ আলোক প্রাপ্ত হয়েছেন, যা অতি অল্প কয়েকজন মহাপুরুষই লাভ করেছেন।"

ডঃ এইচ. বি. কুলকার্নী
প্রফেসর অব্ ইংলিশ এণ্ড ফিলসফি
উটা স্টেট ইউনিভার্সিটি, লোগান, উটা

"আজকের দুর্দশাগ্রস্ত জগতে ভক্তিবেদান্ত স্বামীর এই গ্রন্থগুলি নিঃসন্দেহে এক অতুলনীয় অবদান।"

ডঃ সুদা এল ভাট
প্রফেসর অব্ ইণ্ডিয়ান ল্যাঙ্গুয়েজেস্
বোস্টন ইউনিভার্সিটি, বোস্টন, ম্যাসাচুসেট্স্

"কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামী রচিত শ্রীচৈতন্য-চরিতামৃতের এ. সি. ভক্তিবেদান্ত স্বামী প্রভুপাদ কৃত অনুবাদগুলি ভারত-তত্ত্ববিদ্ এবং ভারতের পারমার্থিক জ্ঞান সম্বন্ধে আগ্রহী সাধারণ মানুষ, উভয়ের কাছেই এক মহা আনন্দের বিষয়।

"...গভীর মনোযোগ সহকারে যে-ই তাঁর ভাষ্যগুলি পাঠ করবে, সে-ই বুঝতে পারবে যে, তাঁর অন্যান্য গ্রন্থের মতো এই গ্রন্থটিও শ্রীল ভক্তিবেদান্ত স্বামীর প্রগাঢ় ভগবদ্ভক্তি, চিন্তা, আবেগ এবং বিশিষ্ট পাণ্ডিত্যপূর্ণ বুদ্ধিমত্তার এক সুষ্ঠু সমন্বয়।"

"...অত্যন্ত মনোরমভাবে সংকলিত এই গ্রন্থগুলি ভারতীয় অধ্যাত্মবাদ এবং ধর্ম সম্বন্ধীয় গ্রন্থে আসক্ত মানুষের পাঠাগারগুলি অলংকৃত করবে, তা তিনি পণ্ডিতই হোন, ভক্তই হোন অথবা সাধারণ পাঠকই হোন।"

ডঃ জে. ব্রুস লঙ্গ
ডিপার্টমেন্ট অব্ এশিয়ান স্টাডিস,
কর্নেল ইউনিভার্সিটি